মে ২০১৮ -বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

সচিত্র বাংলাদেশ

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বঙ্গবন্ধু ও নজরুল
শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট
শ্রমিক অধিকার রক্ষায় সমাজের দায়িত্ব

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন, কিনুন ও লেখা পাঠান

লেখা পাঠাতে ই-মেইল করুন
email : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com

- গ্রাহকগণের যোগাযোগের সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। নগদে বা মানিঅর্ডারে গ্রাহকমূল্য পাওয়ার পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি প্রতি মাসে ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- ক্রয়, এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৩১১৪২
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: editornobarun@dfp.gov.bd ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

নবারুণ

নিয়মিত পড়ুন, কিনুন, লেখা ও মতামত পাঠান। এখন মোবাইল অ্যাপে পাওয়া যাচ্ছে।

লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান
email : editornobarun@dfp.gov.bd

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৩১১৪২
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: editornobarun@dfp.gov.bd ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 38, No. 11, May 2018, Tk. 25.00

বাংলাদেশে কম্পিউটারে কর্মরত তরুণ-তরুণীরা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

মে ২০১৮ ❑ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

১৭ই মে ১৯৮১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন–ফাইল ছবি

সম্পাদকীয়

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হওয়ার সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন। দেশে ফেরার পরিবেশ না থাকায় তাঁরা বিদেশেই অবস্থান করেন। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ছয় বছরের নির্বাসন শেষে বাংলার মানুষের ভালোবাসার টানে শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ই মে স্বদেশে ফিরে আসেন। এ নিয়ে একাধিক নিবন্ধ রয়েছে এ সংখ্যায়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্মবার্ষিকী ২৫শে বৈশাখ ১৪২৫। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর অবাধ বিচরণ। প্রথম বাঙালি হিসেবে ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি আমাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। তাঁর স্মরণে এ সংখ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রয়েছে।

প্রেম, দ্রোহ ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মবার্ষিকী ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে অসুস্থ কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতীয় কবির মর্যাদা দেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর শানিত লেখনির মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীকে পরিণত হন। তাঁদের স্মরণে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রয়েছে এই সংখ্যায়।

পয়লা মে মহান মে দিবস। শ্রমিক সমাজ ও মেহনতি মানুষের অধিকার ও স্বীকৃতি আদায়ের আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে সারাবিশ্বে মে দিবস পালিত হয়। ১৮৬৬ সালের মে মাসে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদ, প্রাণ বিসর্জন এবং পরবর্তী ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত বিজয় আজও সারাবিশ্বে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় সরকারিভাবে পালিত হয়। মে দিবস উপলক্ষে নিবন্ধ রয়েছে এবারের সংখ্যায়।

১৪ই মে বিশ্ব মা দিবস, ২৮শে মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস এবং ২৯শে মে বিশ্ব শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধসহ এবারের সচিত্র বাংলাদেশ-এ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এবং অক্ষারজয়ী কিংবদন্তী চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। এছাড়া রয়েছে গল্প, কবিতাসহ অন্যান্য নিয়মিত বিষয়। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

DFP

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক**
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ
বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪
ড. গোলাম রহমান
শেখ হাসিনা দেশে ফিরে না এলে কী হতো ৭
ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী
বঙ্গবন্ধু ও নজরুল ৯
অনুপম হায়াৎ
শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজের দায়িত্ব ১১
আতিকুল ইসলাম
শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ১৫
ড. মীজানুর রহমান
বিশ্বকবির আবির্ভাব ও নোবেল অর্জন ১৭
মাসুদ আহমেদ
সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ ২০
আফরোজা পারভীন
ইতিহাসের আলোকে মে দিবস ২২
সুহৃদ সরকার
কোথায় নেই তিনি ২৪
আইয়ুব হোসেন
স্বদেশে ফিরে এলেন শেখ হাসিনা ২৬
শামস সাইদ
কিশোর নজরুল: সাহিত্যাঙ্গনের পূর্ব সময়কার কথা ২৯
আখতারুল ইসলাম
ঠাকুর পরিবারের ইতিকথা ৩০
খালেক বিন জয়েনউদদীন
নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা ৩৩
ইফফাত আরা দোলা
রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃণালিনী ৩৫
আখতার হামিদ খান
মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ৩৬
মো. আব্দুল লতিফ বকসী
দুর্যোগ মোকাবিলায় নগর স্বেচ্ছাসেবক ৩৭
মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান
রবীন্দ্রনাথের ঘরসংসার ৩৮
আনসার আনন্দ
২রা মে: সত্যজিৎ রায়ের ৯৭ তম জন্মবার্ষিকী ৪০
আপন চৌধুরী
কাজী নজরুল ইসলামের সৈনিক জীবন ৪২
ম. মীজানুর রহমান

হাইলাইটস

ফিচার
২৮শে মে: নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ৪৩
নাহিদা সুলতানা
মায়ের অধিকার সন্তানের কাছে সবচেয়ে বেশি ৪৪
সিনথিয়া পারভীন
বিশ্বজুড়ে সুনাম বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের ৪৯
আফিয়া খাতুন
গল্প
এক চিলতে মাটি ৪৬
জয়া সূত্রধর
কবিতাগুচ্ছ
শাফিকুর রাহী, আতিক আজিজ, রোকসানা গুলশান
ফরিদ আহমেদ হৃদয়, জাহাঙ্গীর আলম জাহান ৩২
আবদুল আউয়াল রণী, জানির আহম্মেদ
মুহাম্মদ ইসমাঈল, আয়েশা ছিদ্দিকা ৪৮
বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৫১
প্রধানমন্ত্রী ৫১
তথ্য মন্ত্রণালয় ৫৩
জাতীয় ঘটনা ৫৪
আন্তর্জাতিক ৫৫
জেন্ডার ও নারী ৫৬
উন্নয়ন ৫৬
শিক্ষা ৫৭
প্রতিবন্ধী ৫৭
স্বাস্থ্যকথা ৫৮
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৮
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৫৯
কৃষি ৫৯
যোগাযোগ ৬০
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬০
সামাজিক নিরাপত্তা ৬১
নিরাপদ সড়ক ৬১
মাদক প্রতিরোধ ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬২
সংস্কৃতি ৬২
শিল্প-বাণিজ্য ৬২
চলচ্চিত্র ৬৩
ক্রীড়া ৬৪

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে 'শেখ হাসিনা' নামটি হৃদয় অনুভূতির প্রকাশ্য প্রতীক। ১৯৮১ সালের ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে শেখ হাসিনাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হত্যাকাণ্ডের সময় বিদেশে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যাওয়া শেখ হাসিনা নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন দিল্লিতে। সভাপতি পদ গ্রহণে শেখ হাসিনাকে রাজি করানো এবং দেশে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগের অংশ হিসেবে দিল্লিতে একাধিক বৈঠকে বসেন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। বাংলার মানুষের ভালোবাসার আহ্বানে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি ৬ বছরের নির্বাসন শেষে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফেরেন। এ নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মীজানুর রহমানের বিশেষ নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-১৫।

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক। মূলত কবি হিসেবেই তাঁর প্রতিভা সারাবিশ্বে পরিচিত। ১৯১৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পৃথিবীতে যুগে যুগে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে রূপান্তর ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথ সবকিছুকেই আত্মস্থ করেছেন গভীর অনুশীলন, ক্রমাগত নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে। তাই তাঁর সাহিত্যে জীবনের নানা পর্যায়ের বিষয় ও আঙ্গিকের নিরন্তর পালাবদল লক্ষণীয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল তাঁর অসংখ্য কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, ভ্রমণকাহিনি, চিঠিপত্র এবং দেশে-বিদেশে প্রদত্ত বক্তৃতামালা। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর গানের বাণী ও সুর, অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ, দুর্দিনে জাতিকে সাহস জুগিয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথের গানকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেন। এ নিয়ে সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ড. গোলাম রহমানের বিশেষ নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৪।

বঙ্গবন্ধু ও নজরুল

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালির শৌর্যবীর্যের গৌরবগাথা। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন 'রাজনীতির কবি'। বঙ্গবন্ধু সেই কৈশোরেই স্কুলে থাকতে কবি নজরুলের নাম জেনেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন লেখা পড়েছেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে কবির সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা, মানবিকতা ও দূরদর্শিতার ফলে বাংলাদেশের জাতীয় কবির সর্বোচ্চ সম্মানিত আসন অলংকৃত করেছেন নজরুল, যা সমগ্র জাতির কাছে অতীব গৌরবের বিষয়। এর ওপরে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব অনুপম হায়াৎ-এর প্রবন্ধ বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-৯।

মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নামে বাংলাদেশের কৃত্রিম উপগ্রহটি এখন মহাকাশে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এটি একটি বড়ো অর্জন। এ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের উন্নয়নে এক বিরাট মাইলফলক। বাংলাদেশ বিশ্বের ৪৭তম দেশ হিসেবে মহাকাশে স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাইভেট কোম্পানি দি আমেরিকান ফার্ম স্পেস-এক্স-এর মাধ্যমে ফ্লোরিডায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৩৬।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

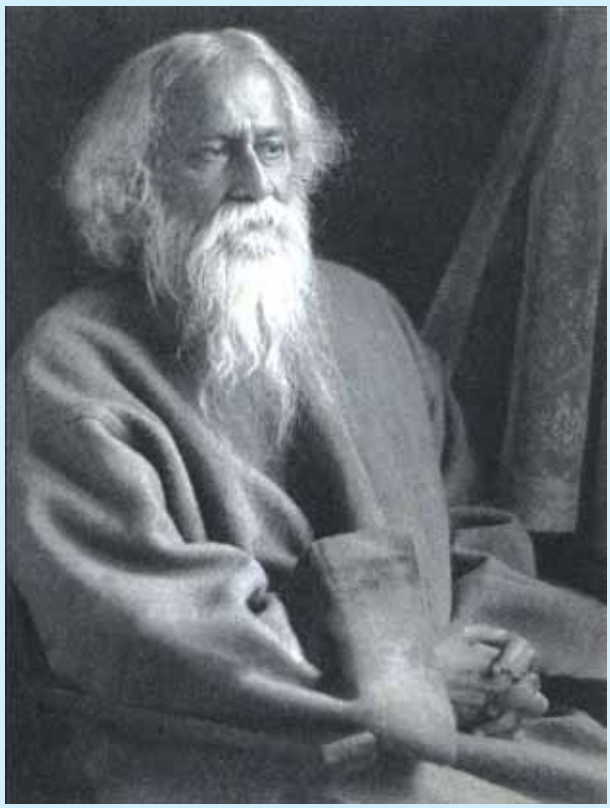

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ড. গোলাম রহমান

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক। মূলত কবি হিসেবেই তাঁর প্রতিভা সারাবিশ্বে পরিচিত। ১৯১৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এশিয়ার বিদগ্ধ ও বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পুরস্কার জয়ের গৌরব অর্জন করেন।

পৃথিবীতে যুগে যুগে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে রূপান্তর ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথ সবকিছুকেই আত্মস্থ করেছেন গভীর অনুশীলন, ক্রমাগত নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। তাই তাঁর সাহিত্যে জীবনের নানা পর্যায়ের বিষয় ও আঙ্গিকের নিরন্তর পালাবদল লক্ষণীয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল তাঁর অসংখ্য কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, ভ্রমণকাহিনি, চিঠিপত্র এবং দেশ-বিদেশে প্রদত্ত বক্তৃতামালা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর অভিজাত ঠাকুর পরিবারে। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এই পরিবারের পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যবসায়ের সূত্রে কলকাতায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় এ বংশের জমিদারি এবং ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে লালিত এবং আত্মপ্রতিষ্ঠিত দ্বারকানাথ ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি অনেক সমাজসেবামূলক কাজেও সাফল্য অর্জন করেন।

রবি ঠাকুর ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪তম সন্তান। তাঁর মা সারদা দেবী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন দার্শনিক ও কবি। মেজভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম ভারতীয় আইসিএস। অন্য ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও নাট্যকার এবং বোনদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী ঔপন্যাসিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ ছিল সংগীত, সাহিত্য ও নাট্যাভিনয়ে মুখর। শুধু তাই নয়, বাইরের জগতের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল নিবিড়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালের অপূর্ব স্মৃতি-আলেখ্য রচনা করেছেন *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে। কলকাতার সেই প্রাসাদসম বাড়িতে ছিল পুকুর, বাগান এবং আরো অনেক রহস্যঘেরা জায়গা। ভৃত্যদের শাসন এড়িয়ে বালক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দূরে কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর শিশুমন বাইরের বিপুল বিচিত্র কল্পনায় ব্যাকুল হয়ে উঠত। তাঁর পরবর্তী জীবনের কবিতায়, গানে এবং দেশ-বিদেশে পর্যটন শৈশবের এই আকাঙ্ক্ষাই যেন নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কলকাতায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। তারপর বেশ কয়েক বছর তিনি পড়েন বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত নর্মাল স্কুলে। সেখানেই তাঁর বাংলা শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হয়। সবশেষে তাঁকে ভর্তি করা হয় সেন্ট জেভিয়ার্সে। কিন্তু অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য তাঁর স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে বাড়িতে বসে পড়াশুনা চলতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৭৩ সালে পিতার সাথে হিমালয় ভ্রমণ। পথে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে কিছুদিন তাঁরা অতিবাহিত করেন। সেই প্রথম কবি নগরের বাইরে প্রকৃতির বৃহৎ অঙ্গনে পা রাখেন। এই যাত্রায় পিতার স্নেহসিক্ত সান্নিধ্য লাভ রবীন্দ্র জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পিতার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আদর্শ তাঁকে অভিভূত করে। হিমালয়ের নির্জন বাসগৃহে তিনি পিতার নিকট সংস্কৃত পড়তেন। সন্ধ্যায় মহর্ষি তাঁকে চিনিয়ে দিতেন আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র।

হঠাৎ যেন হিমালয় থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করেন। এরপর তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চা অনেকটাই বাধামুক্ত হয়। এ সময় গৃহশিক্ষকের নিকট তাঁকে পড়তে হয় সংস্কৃতি, ইংরেজি, সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রাকৃত বিজ্ঞান প্রভৃতি। এর পাশাপাশি চলতে থাকে ড্রয়িং, সংগীত শিক্ষা এবং জিমন্যাস্টিকস। নিয়মিত স্কুলে যাওয়া বন্ধ হলেও কবির সাহিত্যচর্চা অব্যাহত থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ' *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৮১ বঙ্গাব্দের (১৮৭৪) অগ্রহায়ণ মাসে (কারো কারো মতে, প্রথম কবিতা 'ভারতভূমি' e½`k©b পত্রিকায় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়)। তাঁর দ্বিতীয় মুদ্রিত কবিতা 'প্রকৃতির খেদ'। এ দুটো কবিতা তিনি পড়েছিলেন ঠাকুর বাড়ির বিদ্বজ্জন সভায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৭৪ সালের গোড়ার দিকে ঠাকুর বাড়ির মনীষীরা বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক, সংবাদপত্র-সম্পাদকসহ বিদগ্ধজনদের আহ্বান করে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামে এক সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজন করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্মিলনীর উদ্যোক্তা।

সেসময় রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়নের মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। একই সঙ্গে চলে সাহিত্যচর্চাও। *জ্ঞানাঙ্কুর* ও *প্রতিবিম্ব* পত্রিকায় তাঁর 'বনফুল' এবং *ভারতী* পত্রিকায় *কবি-কাহিনি* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। *ভারতী* পত্রিকা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হতো। *জ্ঞানাঙ্কুর* সাহিত্যপত্রে সেকালের বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্থান

পেয়েছিলেন। এর অন্যতম কারণ হিন্দুমেলায় পঠিত তাঁর কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। যে স্বদেশি চেতনা দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে সহজেই বিকাশ লাভ করেছিল, তারই আনুকূল্যে প্রবর্তিত হয় মেলা। বাঙালির জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের ইতিহাসে হিন্দুমেলা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৮৮৩ সাল। তারিখ ৯ই ডিসেম্বর। রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হলো মৃণালিনী দেবী রায় চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি বাংলাদেশের খুলনার বেণীমাধব রায় চৌধুরীর মেয়ে। রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর দুই পুত্র এবং তিন কন্যা ছিল।

এরপর রবীন্দ্রনাথের জীবনে শুরু হয় আর এক অধ্যায়। ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিলেত যান এক মাসের জন্য। অক্টোবর মাসে ফিরে আসার পর পিতার আদেশে তাঁকে জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম বিচিত্র পথ খুঁজে পায়। এতদিন তিনি যে কাব্য, নাটক আর উপন্যাস লিখেছেন তার সবই ছিল ভাবমূলক এবং বিশুদ্ধ কল্পনার বস্তু। এবার তিনি লোকজীবনের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পান এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দরিদ্র মানুষের সাধারণ জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। কবি কল্পনার জগৎ থেকে নেমে আসেন বাস্তব পৃথিবীর প্রত্যক্ষ জীবনে। এরফলেই রচিত হয় বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ 'গল্পগুচ্ছের' গল্পগুলো। এছাড়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি অপরূপ রূপে প্রতিভাত হয় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রে– যেগুলো ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী নামে সংকলিত হয়। জীবনের এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি তদারকি উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান– গাজীপুর, শাহজাদপুর, পতিসর, কালিগ্রাম ও শিলাইদহে ঘুরে বেড়ান। এই সূত্রেই শিলাইদহে গড়ে ওঠে একটি কবিতীর্থ। পদ্মা বক্ষে নৌকায় চড়ে বেড়ানোর সময় পদ্মা নদী, বালুচর, কাশবন, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, দরিদ্র জীবন এবং সেখানকার সাধারণ মানুষের হৃদয়লীলা কবিকে গভীরভাবে আলোড়িত করে, যা এ পর্বের গল্পে ও কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনো সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হননি, তবে সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নও রাখেননি বরং তিনি ছিলেন স্বদেশিকতার বরেণ্য পুরুষ। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় যে কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, 'বন্দে মাতরাম' গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্‌বোধন করেন। *সাধনা*, *বঙ্গদর্শন* ও *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেন। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কবি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং রাখিবন্ধনের দিনটিকে স্মরণ করে রচনা করেন একটি গান:

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।

ঠিক এই সময় স্বদেশ পর্বের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য গান রচিত হয়। তাঁর দুটি গান বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করে। এসময় রবীন্দ্রনাথ দেশ ও সমাজকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার বিস্তৃত কর্মসূচি তুলে ধরেন তাঁর বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' (ভাদ্র ১৩১১/১৯০৪) প্রবন্ধে। এতেই তিনি পল্লি সংগঠন সম্পর্কে গঠনাত্মক কার্যপদ্ধতি লোকশিক্ষা, সামাজিক কর্তৃত্ব, সমবায় প্রভৃতি জনসেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর পল্লি সংগঠনমূলক কাজের সূত্রপাত ঘটে শিলাইদহে বসবাসকালে। দরিদ্র প্রজাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য তিনি বেশকিছু কর্মসূচি চালু করেন, যার মধ্যে ছিল– শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সড়ক নির্মাণ ও মেরামত, ঋণের দায় থেকে কৃষকদের মুক্তিদান প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বার বার নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ১৯০২ সালে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। এর কয়েক মাসের মধ্যে কন্যা রেণুকা মারা যান। ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন এবং ১৯০৭ সালে মৃত্যু ঘটে কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের। এতগুলো শোক রবীন্দ্রনাথকে বিহ্বল করে তুললেও তিনি শান্তচিত্তে আশ্রমের দায়িত্ব পালন করে যান।

সাহিত্য জীবনে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন পর্বের ছাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে রচিত নৈবেদ্য কাব্য এবং নানা প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের ধ্যান ও তপস্যার রূপ ফুটে ওঠে। *চোখের বালি* (১৩০৯), *নৌকাডুবি* (১৩১৩) ও *গোরা* (১৩১৬) উপন্যাসে একদিকে জীবনের বাস্তবতা, মনস্তত্ত্ব এবং অন্যদিকে স্বদেশের নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন তিনি।

তাঁর অসাধারণ গান বিচিত্র সৃষ্টির অন্যমত ধারা। এই সংগীত-প্রতিভা পারিবারিক সূত্রেই অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয় তাঁর মধ্যে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে গানের বাণী ও সুরে নব নব নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে তিনি নির্মাণ করেন সংগীতের এক স্বতন্ত্র জগৎ, যা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি এবং কালে কালে এই রবীন্দ্রসংগীত হয়ে ওঠে কালজয়ী।

১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, মনীন্দ্রনাথ নন্দী এবং অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তি মিলে সাড়ম্বরে কবির জন্মোৎসব পালন করেন। নোবেল পুরস্কার জয়ের পূর্বে এটাই ছিল কবির প্রতি স্বদেশবাসীর প্রথম সম্মান জ্ঞাপন।

সময়টা ১৯১২ সালের জুন মাস। রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড পৌঁছেন রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। শিল্পী রোটেনস্টাইনের সঙ্গে কবির আগেই পরিচয় হয়েছিল কলকাতায় ১৯১১ সালে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাতে তুলে দেন নিজের করা কবিতার অনুবাদ। রোটেনস্টাইনের গৃহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট কবি ও পণ্ডিতদের। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুজনের একজন ইংরেজ কবি ইয়েটস ইংরেজি গীতাঞ্জলির ভূমিকা লিখে পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির পথ প্রশস্ত করেন, অন্যজন সিএফ এন্ড্রুজ। পরবর্তীকালে গান্ধীও রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভক্ত হন। ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কবিতা পড়ে শোনান। তাঁর 'ইন্ডিয়া সোসাইটি' থেকে ইয়েটসের চমৎকার ভূমিকাসহ ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, মালিনী ও ডাকঘর নাটকেরও ইংরেজি অনুবাদ হয় এবং এরফলে ইউরোপ তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে গ্রহণ করে। ইংল্যান্ড থেকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় যান। ১৯১৩ সালের অক্টোবরে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সে বছরই নভেম্বর মাসে গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্মান নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

১৯১৬ সালে কবি জাপান যান। এই ভ্রমণে তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুজন ভারত অনুরাগী উইলিয়াম পিয়ারসন ও সিএফ এন্ড্রুজ এবং তরুণ শিল্পী মুকুল দে। জাপান সংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল কলকাতায় চিত্রশিল্পী ওকাকুরার সান্নিধ্যে। তখন তিনি

জাপানের মহৎ দিকটিকেই দেখেছিলেন। কিন্তু এবার তাঁর চোখে পড়ে বিপরীত চিত্র। তাই তিনি রচনা শুরু করেন Nationalism বিষয়ক ভাষণগুলো। সেই ভাষণ তিনি আমেরিকাতেও পড়েন। এছাড়া সেখানে কবি তাঁর শিক্ষার আদর্শ, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, ব্যক্তি ও বিশ্বের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন, যেগুলো সংকলিত হয় *Personality* (১৯১৭) নামক গ্রন্থে।

এই বিদেশ ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা ইংরেজ প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান, যা তাঁকে প্রদান করা হয় ১৯১৫ সালে। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল রাওলাট অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবির জালিয়ানওয়ালাবাগে এক জনসমাবেশে ভারতীয়দের ওপর ব্রিটিশ পুলিশ আকস্মিকভাবে গুলি চালিয়ে অসহায় ব্যক্তিদের হত্যা করে। ইংরেজের এই অত্যাচারী মূর্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ ভাইসরয়কে এক পত্র লিখে 'নাইট' উপাধি ফিরিয়ে দেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২০ সালে আবার ইংল্যান্ড এবং সেখান থেকে ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম হয়ে আমেরিকা যান। এবার নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে তিনি বিশ্বভারতীর কথা জানাতে চেয়েছেন। তবে তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। এ যাত্রায় তিনি জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক ও সুইডেন ভ্রমণ করেন। ইউরোপে কবি পান রাজার সম্মান। তাঁর এ পর্বের বক্তৃতার সংকলন Creative Unity (১৯২২), তাতে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্ববোধ ও মানব ঐক্যের বাণী।

রবীন্দ্রনাথ ষাট বছর বয়সে চিত্রচর্চা শুরু করেন। লেখার কাটাকুটি থেকেই এ চর্চার সূচনা। প্যারিস, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠিত কবির চিত্র প্রদর্শনী শিল্প রসিকদের মুগ্ধ করে। ইতোমধ্যে তিনি রাশিয়া ভ্রমণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ার সামাজিক বিপ্লব এবং তাদের কর্মযজ্ঞ দেখে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলনই 'রাশিয়ার চিঠি'। তারপর তিনি আমেরিকা হয়ে ১৯৩১ সালে জানুয়ারিতে দেশে ফেরেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবি

এটাই ছিল তাঁর শেষ পাশ্চাত্য ভ্রমণ। এরপর কবি দুবার ভারতের বাইরে গিয়েছেন– ১৯৩২ সালে পারস্য ও ইরাকে এবং ১৯৩৪ সালে সিংহলে।

রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানাভাবে সম্মানিত করেছে। ১৯২১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী পদক' তাঁকেই প্রথম প্রদান করা হয়। ১৯৩২-এ সেখানে প্রদত্ত 'কমলা বক্তৃতায়' কবি বলেন 'মানুষের ধর্ম' সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করে কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং ১৯৩৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের শেষ দশ বছর বহু কাব্য, গান, নৃত্যনাট্য, ভ্রমণকাহিনি, সমালোচনা, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ রচনা করেন। এ পর্বে এসে তাঁর রচনায় নতুন যুগের স্পর্শ লাগে। এ সময় রচিত তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১৫টি। তারমধ্যে *পুনশ্চ* (১৯৩২), *শেষ সপ্তক* (১৮৩৫), *পত্রপুট* (১৯৩৬) ও *শ্যামলী* (১৯৩৬) গদ্যছন্দে লেখা। এরপর কবি ক্রমশ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠেন। মৃত্যুভাবনা তাঁকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে। তার প্রতিফলন ঘটে *প্রান্তিক* (১৯৩৮)-এর কবিতায়। কবির মন আবার ধাবিত হয় মানবসমাজের দিকে, রূপকথার জগতে, বাউলের মনের মানুষের বেদনায়। কিন্তু অন্যদিকে সাহিত্যে লেখেন গদ্যগান। নৃত্যনাট্যগুলো তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। পুরনো কবিতাকে তিনি রূপ দেন নৃত্যনাট্যে, রচনা করেন *চিত্রাঙ্গদা*, *শ্যামা* ও *চণ্ডালিকা*। নটরাজ, নবীন, শ্রাবণগাথা এগুলো নিসর্গ প্রকৃতির সংগীতরূপ। কবির শেষ দশকের উপন্যাস *দুইবোন* (১৯৩৩), *মালঞ্চ* (১৯৩৪) এবং *চার অধ্যায়* (১৯৩৪)।

জীবন সায়াহ্নে এসে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের নানা জটিল তত্ত্ব নিয়ে ভেবেছেন। তারই ফসল *বিশ্ব পরিচয়* (১৯৩৭)। বিজ্ঞানের প্রতি কবির সহজাত অনুরাগ ছিল শৈশব থেকেই। প্রাণিবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে তিনি প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রথম জীবনে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সাহচর্য ও সখ্য বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর কৌতূহল বাড়িয়ে তোলে। তাঁর সমগ্র কাব্য সাহিত্যে এক সজাগ বিজ্ঞানচেতনা ও দার্শনিক উপলব্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। ইউরোপ সফরকালে রবীন্দ্রনাথ জার্মানিতে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সমকালীন বিজ্ঞানের গতিময়তার সুর তাঁর অসংখ্য কবিতায় ধ্বনিত। কবির প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার অন্তরালেও ফুঠে উঠেছে বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। *সে* (১৯৩৭), *তিন সঙ্গী* (১৯৪০), *গল্পসল্প* (১৯৪১)–এসব গ্রন্থে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার গল্প উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্বমনস্ক কবি মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যক্ষ করেছেন মানবসভ্যতার গভীর সংকটকে। তথাপি তিনি মানুষের মহত্ত্বে চির আস্থাবান ছিলেন। *কালান্তর* (১৯৩৭) ও *সভ্যতার সংকট* (১৯৪১)-এ কবির সেই বিশ্বাসের সুর অক্ষুণ্ন রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম বাণী *সভ্যতার সংকট*। এ ভাষণ তিনি পড়েছিলেন তাঁর শেষ জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে। সেবার কবির ৮০ বছর পূর্ণ হয়। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কবি কালিম্পং গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

লেখক: রবীন্দ্র গবেষক ও সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার

ফটোফিচার: মো. ফরিদ হোসেন

শেখ হাসিনা দেশে ফিরে না এলে কী হতো

ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

মুজিবনগর দিবস ও প্রাসঙ্গিক কথা বলতে গিয়ে মুজিবনগর সরকার গঠিত না হলে কী হতো তা নিয়ে আমি বলেছিলাম–

১. অনেকগুলো সরকার হতো, একটা সেনা সরকারও হতে পারত, যার ফলে স্বাধীনতা কোনোদিন অর্জিত হতো না। ২. ভারতের কাছ থেকে তেমন কোনো সাহায্য-সহায়তাও মিলত না। অনেকগুলো সরকারের মধ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুদ্ধটাই ভেস্তে যেত। ৩. শরণার্থীরা আশ্রয় পেত না এবং পেলেও শরণার্থী, এমনকি মুক্তির জন্য জিম্মি নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা ক্রমশ পাকিপক্ষ সমর্থন করত। ৪. যুদ্ধের জন্য আশ্রয়, ট্রেনিং ও অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যেত। কেননা ভারতের সর্বজনীন সমর্থনটা বিভক্ত হয়ে পড়ত। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি অকল্পনীয় হতো। ৫. উগ্র-বামদের উত্থান হতো এবং তাদের নিয়ে চীনের মধ্যস্থতায় একটা দাস-প্রভু সমাধান হতো। সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভারত আমাদের যুদ্ধে সম্পৃক্ত করতে কোনো উদ্যোগ নিত না। ৬. দালালের সংখ্যা অধৈর্য বাঙালিদের মধ্যে বেড়ে যেত। কোনো গেরিলা অপারেশন চালানো যেত না। ৭. শেষমেশ কিছু দালাইলামা ভারতে থেকে যেত, যারা কোনোদিনও দেশে ফিরতে পারত না। ৮. স্বীকৃতির প্রশ্ন আসলেও কাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে তা নির্ধারণ কঠিন ব্যাপার হতো। ৯. গণপ্রশাসন অসম্ভব হতো। বড়ো কথা হলো, যে ঐতিহাসিক অভূতপূর্ব ঐক্যের কারণে বঙ্গবন্ধু অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল তা ভেঙে যেত। ফলাফল শুধু কল্পনাই করা যায়। ১০. সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটোর পর ভেটো দিতে পারত না। ১১. সপ্তম নৌবহর ক্রিয়াশীল হতো। ১২. অনেক সরকারের মধ্যে বেশির ভাগের সম্মতিতে বড়োজোর একটা কনফেডারেশনের রূপ হতো। ১৩. ক্রমাগত জৈবিক প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানিকরণ সইতে না পেরে সাধারণ মানুষ ক্রমশ দলে দলে আত্মসমর্থন করত।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে না আসলে কী হতো, তারও একটি দৃশ্যপট অন্যত্র দিয়েছি যার সারাংশ নিম্নরূপ:

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধু ফিরে না আসলে দেশে কী হতো? সংক্ষেপে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু ফিরে না এলে দেশে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হতো। সে পরিস্থিতি ঠেকাতে ভারতীয় মিত্ররা স্থায়ীভাবে এদেশে থেকে যেতেন। গুটি কয়েক দেশ ছাড়া কেউ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিত না। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো জোট বেঁধে পাকিস্তানের সমর্থনে নেমে পড়ত। এখানে একটা নতুন লেবানন সৃষ্টি হতো। উন্নয়নের জন্য অর্থ পাওয়া যেত না। শাসক দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে সবকিছু শেষ না হলেও শেষ হওয়ার উপক্রম হতো।

তারপরও অকৃতজ্ঞদের একাংশ তাঁকে সপরিবার হত্যা করে। ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। সেদিন হাতে-গোনা কিছু মানুষ তার প্রতিবাদে রাস্তায় নামল। যারা রাস্তায় নামল তারা আকার-আকৃতিতে ছোটো ছিল। বড়ো আকারের বড়ো সুবিধাভোগীরা তখন অনেকেই সেদিন আমাদের দুর দুর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল। কেউ কেউ আবার উল্লাসে মেতেছিল এবং 'এসব একনায়কদের পরিণতি এমন হয়' বলে মন্তব্য করেছিল। তারপরও কিছু নিঃস্বার্থ মানুষ বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসার টানে ও মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ সুরক্ষায় রাস্তায় নেমেছিল।

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রায় ৬ বছর পর দেশে ফিরে আসেন ১৯৮১ সালের ১৭ই মে। অবশ্য তিনি আবারো ২০০৭ সালের ৭ই মে স্বল্প সময়ের বিদেশ বাসের পর বহু বাধাবিঘ্ন ঠেলে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৮১ সালে তিনি দেশে ফিরে না আসলে বাংলাদেশের অনেক কিছুই কেউ জানত না বা অনেক কিছুই অপ্রাসঙ্গিক হতো।

সেদিন যদি তিনি দেশে ফিরে না আসতেন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানটি হয়ত টিম টিম করে বেঁচে থাকত, যার ফলে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশ হারিয়ে যেত। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কনফেডারেশন সম্ভব না হলেও দেশটি একটি মিনি

পাকিস্তানে রূপান্তরিত হতো। দেশটি কম করে হলেও ইসলামি প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হতো আর রাজাকাররা চিরস্থায়ী রাজা হয়ে সবার শিরে চেপে বসত। মুক্তিযোদ্ধাদের বিচার হতো, মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ তিব্বতের দালাইলামা সম ও তার অনুসারী কাঞ্চা ও কাঞ্চিতে রূপান্তরিত হতো। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের অকাতরে খুন করা হতো, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত পরিবর্তন হয়ে যেত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকত না অর্থাৎ আমাদের দীর্ঘমেয়াদি মুক্তির যুদ্ধটা স্থগিত হয়ে যেত। ধনী আরো ধনী হতো, দরিদ্র আরো দরিদ্র হতো। ক্রমশ প্রতিটি মানুষ ইসলামাবাদের গোলামে পরিণত হতো, ধর্মের ধ্বজাধারীরা দেশটাকে চষে বেড়াতো, বাংলা ভাষা ও জাতি বিলুপ্তির পথে যেত। মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্যগুলো মূর্তি আখ্যায়িত করে বিলুপ্ত করা হতো। শহিদমিনারগুলো সব উঠে যেত। বাঙালির সংস্কৃতি তলিয়ে যেত।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর পুরো সময় তো শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ছিলেন না। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের ওপর এতটা চাপ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ক্ষমতাসীন প্রতিপক্ষরা সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন এনে দেশটাকে ইসলামি রিপাবলিকে ঠেলে দিতে পারেনি। তিনি ফিরে না এলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের গহ্বরে হারিয়ে যেত। আমাদের দেশটা হতো একান্তই সাম্প্রদায়িক দেশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান শান্তিটুকুও প্রতিষ্ঠিত হতো না। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া ছিল অকল্পনীয়। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটা হতো দা-কুড়ালের। আজকে বিভিন্ন সামাজিক সূচকে আমরা ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছি, সেসব মোটেই সম্ভব হতো না। বিশ্বের বুকে একটা মর্যাদাবান জাতি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার স্বপ্ন দেখছি, তখন স্বপ্ন দেখারও কেউ থাকত কি-না সন্দেহ।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর সব রাজনৈতিক দল বিলোপ করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১লা আগস্ট থেকে দেশে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হয়। সেই আগস্টে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনে প্রয়াস নেওয়া হয়। তখন দলের শীর্ষনেতাদের প্রায় সবাই জেলে। সেসময় প্রয়োজন ছিল ঐক্যের। এমতাবস্থায় সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনকে আহ্বায়ক করে একটা দায়সারা গোছের কমিটি করা হয়। তিনি এক বছরও নেতৃত্বে থাকতে পারেননি। পরবর্তীতে মালেক উকিল ও আবদুর রাজ্জাককে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে কমিটি গঠিত হয়। ১৯৮১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি পুনরায় কাউন্সিলে পূর্ববৎ অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এবারো যখন জোড়াতালি দিয়ে কমিটি গঠন অসম্ভব হয়ে পড়ে ও দল ছিন্নভিন্ন হওয়ার উপক্রম হয় তখন সাধারণ কর্মীরা শেখ হাসিনার নামে স্লোগান দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা ভারতে নির্বাসিত শেখ হাসিনাকে দলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করে। সেদিন তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত না করলে দল বহুধাবিভক্ত হতো। সেনা আশ্রিত দলে পরোক্ষভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে আশ্রয় নিতে নিতে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দলটি নিঃশেষ হয়ে যেত। দেশটাতে এমনকি সেনা শাসন চিরায়ত হয়ে যেত।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর শেখ হাসিনা দেশে আসার কারণে তাঁর দল অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি তিন তিনবার ক্ষমতায় এসেছে। এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্প্রসারিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসায় ব্যক্তির পর্যায় ছাড়িয়ে সামষ্টিক পর্যায়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে ও হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরেছে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে, ২১শে ফেব্রুয়ারি নবমর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন হয়েছে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে, এমনকি সামাজিক উন্নয়ন সূচক দিয়ে আমরা ভারতকে ছাড়িয়ে গেছি। অর্থনীতিতে ক্রমাগত ৬ ভাগের বেশি প্রবৃদ্ধি ঘটতে ঘটতে এখন তা ৭.৬৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। সারাবিশ্বে আর্থিক ব্যবসায় ধস নামলেও বাংলাদেশ ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয় ১৭৫২ ডলার। পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রবৃদ্ধির মাত্রা কাঙ্ক্ষিত পর্যায় ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির সুফল প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছেছে। শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় চোখ ধাঁধানো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে অকল্পনীয় সম্প্রসারণ ঘটেছে। মহাকাশের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করলে এবং জীবন বাজি রেখে সামনে এগিয়ে না গেলে এর কিছুই সম্ভব হতো না। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে, শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আমাদের বহু ক্ষেত্রে উল্লম্ফন ঘটেছে, জাতির মুখ উজ্জ্বল হয়েছে।

লেখক: চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

বঙ্গবন্ধু ও নজরুল

অনুপম হায়াৎ

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ছিলেন বিদ্রোহী কবি। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ছিলেন 'রাজনীতির কবি'। নজরুলের জন্ম ১৮৯৯ সালে আর বঙ্গবন্ধুর জন্ম ১৯২০ সালে। বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যের সময়ে রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্যের আকাশে দীপ্তিময়তার সঙ্গে বিরাজমান। বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণে এই দুই কীর্তিমান সাহিত্যিকের রচনাকর্ম প্রভাব ফেলেছে। পরবর্তীকালের ইতিহাস এই দুই কবির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অবিচল আস্থা-প্রেরণার জাজ্বল্যমান

সাক্ষ্য দেয়। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময়ে এই দুই কবির রচিত কবিতা ও গান উদ্ধৃত করেছেন স্বাচ্ছন্দ্যে এবং রবীন্দ্রনাথের রচিত 'আমার সোনার বাংলা' স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত আর নজরুলের 'চল চল চল' রণসংগীত হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কবি নজরুলকে তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকায় এনে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিয়ে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর মধ্যে নজরুলের বিদ্রোহ ও বিপ্লব সত্তা, গভীর দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এবং বাংলার ইতিহাস-ভূগোল-মানুষ-জীবন-সমাজ-সংস্কৃতিকে ধারণ করে 'জয় বাংলা' স্লোগান ও চেতনায় প্রদীপ্ত হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর পিতা তাঁদের বাড়িতে *দৈনিক আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত* রাখতেন। কাজেই এটা সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে, বঙ্গবন্ধু সেই কৈশোরেই স্কুলে থাকতে কবি নজরুলের নাম জেনেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন লেখা পড়েছেন। কারণ, নজরুল *মাসিক সওগাত*-এ ১৯১৮ সাল থেকে এবং পরে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখতেন। ব্রিটিশ কর্তৃক কবি নজরুলকে জেলবন্দি রাখার সংবাদও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। নজরুল আটবার বৃহত্তম ফরিদপুর সফর করেছেন। বঙ্গবন্ধুর বয়স যখন পাঁচ, সেই ১৯২৫ সালের ১লা মে নজরুল ফরিদপুর প্রথম সফর করেন। তিনি বঙ্গীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দেন। ওই সময় তিনি কবি জসীমউদ্‌দীন ও অন্যান্যের বাড়িতে ১৫ দিন অবস্থান করেন। তিনি গানে, কবিতায়, বক্তৃতায়, হাস্যরসে, আড্ডায় ফরিদপুর মাতিয়ে রাখেন। ওই সময় মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও ফরিদপুরে আসেন। এর কয়েক মাস পর কয়েকজন মুসলমান বিপ্লবী তরুণ নজরুলকে আবার ফরিদপুর নিয়ে আসেন। তিনি সাহিত্যিক হুমায়ূন কবীরের বাড়িতে ছিলেন। এবারো তিনি গানে, কবিতায়, বক্তৃতায়, আড্ডায় ছাত্রদের মাতিয়ে রাখেন।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে নজরুল আবার ফরিদপুরে আসেন নির্বাচনি প্রচার কাজ উপলক্ষে। তিনি ঢাকা ও ফরিদপুর এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। এসময় তিনি কবি জসীমউদ্‌দীনের বাড়িতে ছিলেন এবং রাজনীতিবিদ তমিজউদ্দীন খানের সঙ্গে পরিচিত হন। নজরুল আবার যখন ফরিদপুর আসেন জসীমউদ্‌দীন তখন রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র। ওই কলেজের ছাত্ররা নজরুলকে সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু অনুমতি না পেয়ে অন্যত্র উন্মুক্ত মাঠে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। নজরুল গান গেয়ে ও কবিতা আবৃত্তি করে দর্শক-শ্রোতাদের চিত্ত জয় করেন। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা জীবনে নজরুল ১৯৩৬ এবং ১৯৩৮ সালেও ফরিদপুর সফর করেন এবং জনচিত্ত মাতিয়ে যান।

নজরুলের বার বার ফরিদপুর আগমনের সংবাদ সেকালের স্কুল ছাত্র বঙ্গবন্ধুর অজানা থাকার কথা নয়। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর জন্ম গোপালগঞ্জে। তিনি গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরের বিভিন্ন স্কুলে পড়েছেন। ওই সময় গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর ছিল ফরিদপুর জেলার অধীন। একজন গৃহশিক্ষক কিশোর মুজিবকে নজরুল ও অন্যান্য বিষয়ে প্রভাবিত করেছিলেন।

বেবী মওদুদ সূত্রে জানা যায় যে, ১৯৩৭ সালে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ওই সময় তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন কাজী আবদুল হামিদ। এই শিক্ষক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর কাছেই কিশোর শেখ মুজিবের রাজনৈতিক শিক্ষা ও দীক্ষা হয়। তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা, রবীন্দ্র-নজরুলকে জানার আগ্রহ হামিদ মাস্টারই জাগিয়ে তোলেন।

বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে নজরুলের সংস্পর্শে আসেন ১৯৪১ সালের ১২ই আগস্ট। নজরুল ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। ওই সময় তাঁর সঙ্গে আসেন অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, মুহাম্মদ শামসুল হুদা চৌধুরী ও আবদুর রউফ। এই আয়োজনের উদ্যোক্তা ছিলেন সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ হুমায়ূন কবীর। তবে প্রতিপক্ষের প্ররোচনায় ১৪৪ ধারা জারির ফলে নির্দিষ্ট স্থানের বদলে অন্য স্থানে অনুষ্ঠান হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই উদ্যোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে লিখেছেন–

একটা ঘটনার দিন-তারিখ আমার মনে নাই, ১৯৪১ সালের মধ্যেই হবে, ফরিদপুর ছাত্রলীগের জেলা কনফারেন্সে শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁরা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ূন কবীর, ইব্রাহীম খাঁ সাহেব। সে সভা আমাদের করতে দিল না । ১৪৪ ধারা জারি করল। কনফারেন্স করলাম হুমায়ূন কবীর সাহেবের বাড়িতে। কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব গান শোনালেন...

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু অচিরেই স্বপ্নের পাকিস্তানে বাংলা ভাষা, বাঙালির স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। শুরু হয় নানা শোষণ-পীড়ন-দমননীতি। বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্যের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম ছাত্রলীগ। এ বছরের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবিতে অন্যান্যের সঙ্গে তিনি হন কারারুদ্ধ। পরে ১৫ই মার্চ মুক্তি পান। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের দাবির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে তাঁকে এর যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

পরবর্তীতে তিনি ছাড়া পেলেও আবার গ্রেফতার হন ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে। তাঁকে প্রথমে ঢাকা এবং পরে ফরিদপুর জেলে বদলি করা হয়। বন্দি অবস্থায়ও তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রাখেন কৌশলে। ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তিলাভ করেন ফরিদপুর জেল থেকে।

বঙ্গবন্ধুর বার বার গ্রেফতার ও কারাবন্দি থাকার সময় নজরুলের 'বিদ্রোহী' এবং 'কারার ঐ লৌহ কপাট' ইত্যাদি লেখা অনুপ্রেরণা সঞ্চার করত। ঢাকা এসে তিনি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সভায় যোগ দেন। দেশে তখন চলছে তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৯৫৩ সালের ২৩শে মে, ঢাকায় মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালিত হয়। এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটি তাঁর অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে পাঠ করেন মোশারফ হোসেন চৌধুরী। বঙ্গবন্ধু তখন করাচিতে অবস্থান করছিলেন। প্রবন্ধটি নজরুলের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিদ্রোহী জীবন গড়ার এক নিখুঁত আলাপন হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। এর উপসংহারে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে কবির বিপ্লবী জীবনাদর্শ ছাত্র-যুবক- জনগণের কতখানি প্রয়োজন তা তুলে ধরা হয়।

১৯৪২ সালে কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর ওই সময় বঙ্গবন্ধু বৃহত্তর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৯৪৭-উত্তর পরিবেশে মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু অসুস্থ নজরুলকে দেখতে যান তাঁর কলকাতাস্থ বাসায়। নজরুল গবেষক আসাদুল হকের বর্ণনায় পাওয়া যায় সেই সাক্ষাতের বিবরণ। তিনি লিখেছেন–

> ছাত্রজীবন থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নজরুলের ভক্ত ছিলেন। তাই পাকিস্তান আমলে তিনি মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে কলকাতায় এসে নির্বাক-নিশ্চল নজরুলকে দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের কথা। আমি তখন কলকাতা-পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনার অফিসে কর্মরত। কলকাতায় আমি বসবাস করি। বঙ্গবন্ধু কলকাতায় গিয়েছিলেন কোন কর্মোপলক্ষ্যে। কাজ শেষে উনি কবি নজরুলকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ডেপুটি হাই কমিশনার এ কাজটি আমাকে দিয়েছিলেন, প্রেস-এটাচির সাথে করে বঙ্গবন্ধুকে নজরুলের বাসায় নিয়ে যাবার জন্য। তাই আমি ও তাঁর প্রেস-এটাচি দুজন বঙ্গবন্ধুকে সাথে করে গিয়েছিলাম নজরুলের বাসগৃহে টালাপার্কের মনমথ দত্ত রোডের দোতলার ফ্ল্যাটে।
>
> বঙ্গবন্ধু যখন নজরুলকে দেখতে যান তখন সঙ্গে নিয়ে যান একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ও সন্দেশের একটি প্যাকেট। কবির বাসায় তিনি যখন যান তখন কবি শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আগন্তুক প্রবেশ করতে দেখে কবি উঠে বসেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে হাত উঠিয়ে সালাম জানান এবং নজরুলের হাতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ দেন। কবি হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করেন।

১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই বিজয়ের পর সাংবিধানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর দল তাঁর নেতৃত্বে সরকার গঠনের বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ২৪শে জানুয়ারি প্রদত্ত এক সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু নজরুল প্রসঙ্গে বলেন–

> ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে কবি নজরুল ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শাসক শ্রেণির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কবিতা ও গানের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ফলে রাজরোষে পতিত হয়ে কবি নজরুল কারাবরণ করেছেন।

স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ও অবদান হচ্ছে নজরুলকে ১৯৭২ সালের ২৪শে মে কলকাতা থেকে বাংলাদেশে এনে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা। বঙ্গবন্ধু নজরুল ও তাঁর পরিবারের জন্য ধানমন্ডিতে একটি বাড়ি বরাদ্দ করেন। এই বাড়িতেই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে দেখতে যান। পরে কবির জন্য মাসিক ভাতা মঞ্জুর করা হয়। ঐ বছরই এক বাণীতে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালির স্বাধীন ঐতিহাসিক রূপকার'।

১৯৭৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে কবি নজরুলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডিগ্রি 'ডিলিট' প্রদান করে। ১৯৭৫ সালের ২২শে জুলাই নজরুলের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চিকিৎসকের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য পিজি হাসপাতালে (১১৭ নং কেবিন) স্থানান্তর করা হয়। এই হাসপাতালেই কবির মৃত্যু ঘটে ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট (১৩৮৩ সালের ১২ই ভাদ্র)।

বঙ্গবন্ধু নজরুলের রচনাবলি সুযোগ পেলেই পাঠ করতেন বলে জানা যায়। তাঁর প্রিয় গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নজরুলের 'নমঃ নমঃ বাংলাদেশ মম।'

নজরুল লিখেছেন, 'বাংলা বাঙালির হোক। বাংলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক'। আর বঙ্গবন্ধু স্লোগান দিয়েছেন–'জয় বাংলা'। নজরুল 'পূর্ণ-অভিনন্দন'(যাত্রার গান কাব্যের অন্তর্ভুক্ত) কবিতায় 'জয় বাংলা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। গবেষক শামসুজ্জামান খান লিখেছেন–'নজরুলের কাছে বঙ্গবন্ধু বিশেষভাবে ঋণী তাঁর 'জয় বাংলা' স্লোগানের জন্য'।

আজ দুজনই বেঁচে নেই। কিন্তু নজরুলের বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আছে, আছে বাঙালি। আর আছে সেই অমর স্লোগান– 'জয় বাংলা'।

লেখক: চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ও গবেষক

মহান মে দিবস

শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজের দায়িত্ব

আতিকুল ইসলাম

পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা মহান মে দিবস। শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্বার আন্দোলনের রক্তস্রোত স্মৃতিবিজড়িত এই মে দিবস। শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রতি অবিচারের অবসান ঘটাবার সূতিকাগার বলা হয় মে দিবসকে। প্রায় দেড়শ বছর আগে শ্রমিকদের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় শ্রমজীবী মানুষের বিজয়ের ধারা। সেই বিজয়ের ধারায় উদ্ভাসিত বর্তমান বিশ্বের সকল প্রান্তের প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষ। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর যথাযথ মর্যাদায় ও গুরুত্বের সাথে সারাবিশ্বে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে মহান মে দিবস। পৃথিবীর মেহনতি মানুষের কাছে এ দিনটি একদিকে যেমন খুবই তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অনেক বেশি আবেগ ও প্রেরণার। বিশেষ করে পৃথিবীর কোটি কোটি শ্রমিক জনগোষ্ঠীর কাছে এ দিনটির ত্যাগ, মহিমা ও তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি। কারণ এ দিনটির মাধ্যমে তারা তাদের কাজের প্রকৃত স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই 'ঐতিহাসিক মে দিবস' বা 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' শ্রমিকের মর্যাদা রক্ষার দিন। তাদের ন্যায্য পাওনা আদায় তথা অধিকার আদায়ের দিন। শ্রমিকদের অস্তিত্ব ঘোষণার দিন।

মে দিবসের প্রেক্ষাপট

একজন শ্রমিকের সবচেয়ে বড়ো অধিকার বা দাবি হলো তার শ্রমের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করা। উনিশ শতকের গোড়ার দিককার কথা। তখন দেশে দেশে পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের কষ্টের সীমা ছিল না। মালিকেরা নগণ্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দরিদ্র মানুষের শ্রম কিনে নিত। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাড়ভাঙা শ্রম দিয়েও শ্রমিক তার ন্যায্যমূল্য পেত না। মালিকেরা উপযুক্ত মজুরি তো দিতই না, বরং তারা শ্রমিকের সুবিধা-অসুবিধা, মানবিক অধিকার ও দুঃখকষ্ট পর্যন্ত বুঝতে চাইত না। মালিকেরা তাদের অধীনস্থ শ্রমিককে দাস-দাসীর মতো মনে করত। আর তাদের সাথে পশুর মতো ব্যবহার করত। সুযোগ পেলেই মালিকেরা শ্রমিকের ওপর চালাতো নানা শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন। বলতে গেলে শ্রমিকের ন্যূনতম অধিকারও তখন রক্ষিত হতো না। শ্রমিকের শরীরের ঘাম আর সীমাহীন শ্রমের বিনিময়ে মালিক অর্জন করত অসীম সম্পদ অথচ তার ছিটেফোঁটাও শ্রমিকের ভাগ্যে জুটত না। সপ্তাহে ৭ দিনের প্রতিদিনই গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা অমানবিক পরিশ্রম করত কিন্তু তার বিপরীতে মিলত নগণ্য মজুরি, যা দিয়ে শ্রমিকের সংসার চলত না, স্বজনের মুখে তিন বেলা খাবার তুলে দেওয়া সম্ভব হতো না। পরিবার-পরিজন নিয়ে শ্রমিকের জীবন ছিল দুর্বিষহ। অনিরাপদ পরিবেশে রোগব্যাধি, আঘাত, মৃত্যুই ছিল তাদের নির্মম সাথী। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও দাবি-দাওয়ার কথা মন খুলে মালিক সমাজকে বলতে পারত না। এমনকি তাদের পক্ষ হয়ে বলার মতোও কেউ ছিল না। কাজের যেমন সুনির্দিষ্ট সময় ছিল না, তেমনি ছিল না সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি। চাকরির স্থায়িত্ব ও মজুরিসহ সকল বিষয় ছিল মালিকের ইচ্ছাধীন বিষয়। তখন নির্ধারিত কোনো ছুটি, বেতন বা মজুরির স্কেল বা পরিমাণ ছিল না। চরম বিপদের দিনেও শ্রমিকরা ছুটি পেত না। দায়িত্ব পালনকালে দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতো না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিন-রাতে প্রায়ই ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করত তারা। শ্রমিকরা তাদের দাবি-দাওয়ার কথা বললে মালিকরা তাদের ওপর ক্ষেপে যেত, এমনকি মালিকদের ভাড়াটে লোকেরা তাদের ওপর জুলুম করত। মালিকরা শ্রমিকদের কলুর বলদের মতো খাটাতো। তাদের ওপর অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দিত। এতে শোষণ-নিপীড়ন ও বঞ্চনাই শ্রমিকের পাওনা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে মালিকের সীমাহীন অনাচার, অর্থলিপ্সা ও একপাক্ষিক নীতির ফলে শ্রমিকদের মনে জমতে শুরু করে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও দ্রোহ। এমন অত্যাচার যখন তাদের ওপর চলছিল তখন শ্রমিকরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে তাদের প্রতিবাদ করার সাহসও ছিল না। ধীরে ধীরে শ্রমিকরা সব শ্রেণির শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করল। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রথমে ১০ ঘণ্টা কাজের দাবি ও তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য আন্দোলন করল। বিশ্বের মধ্যে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন 'ফিলাডেলফিয়ার মেকানিক ইউনিয়ন' আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। তাদের এ দাবি মালিকপক্ষও মেনে নেয়, কিন্তু মুখ দিয়ে মেনে নিলেও বাস্তবে শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন অব্যাহতই রাখে।

মে দিবসের ইতিহাস

১৮৬০ সালে শ্রমিকরাই মজুরি না কেটে দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রম নির্ধারণের প্রথম দাবি জানায়। কিন্তু কোনো শ্রমিক সংগঠন ছিল না বলে এই দাবি জোরালো করা সম্ভব হয়নি। এই সময় সমাজতন্ত্র শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। শ্রমিকরা বুঝতে পারে বণিক ও মালিক শ্রেণির এই রক্তশোষণ নীতির বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত হতে হবে। ১৮৮০-৮১ সালের দিকে শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠা করে Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada (১৮৮৬ সালে নাম পরিবর্তন করে করা হয় American Federation of Labor)। এই সংঘের মাধ্যমে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে শক্তি অর্জন করতে থাকে। ১৮৮৪ সালে সংঘটিত '৮ ঘণ্টা দৈনিক মজুরি' নির্ধারণের প্রস্তাব পাস করে এবং মালিক ও বণিক শ্রেণিকে এই প্রস্তাব কার্যকরের জন্য ১৮৮৬ সালের ১লা মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। তারা এই সময়ের মধ্যে সংঘের

আওতাধীন সকল শ্রমিক সংগঠনকে এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানায়। প্রথমদিকে অনেকেই একে অবাস্তব অভিলাষ, অতি সংস্কারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু বণিক-মালিক শ্রেণির কোনো ধরনের সাড়া না পেয়ে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে প্রতিবাদী ও প্রস্তাব বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে থাকে। এ সময় A¨vjvg© নামক একটি পত্রিকার কলাম– 'একজন শ্রমিক ৮ ঘণ্টা কাজ করুক কিংবা ১০ ঘণ্টাই করুক, সে দাসই' যেন জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর সাথে বিভিন্ন সমাজতন্ত্রপন্থি দলও একাত্মতা জানায়। ১লা মে'কে ঘিরে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের আয়োজন চলতে থাকে। আর শিকাগো হয়ে ওঠে এই প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কেন্দ্রস্থল।

১লা মে এগিয়ে আসতে লাগল। মালিক-বণিক শ্রেণি অবধারিতভাবে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ১৮৭৭ সালে শ্রমিকরা একবার রেলপথ অবরোধ করলে পুলিশ ও ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি তাদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালায়। ঠিক একইভাবে ১লা মে'কে মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রস্তুতি চলতে থাকে। পুলিশ ও জাতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা শিকাগো সরকারকে অস্ত্র সংগ্রহে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে। ধর্মঘট আহ্বানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য শিকাগো বাণিজ্যিক ক্লাব ইলিনয় প্রতিরক্ষাবাহিনীকে ২০০০ ডলারের মেশিনগান কিনে দেয়। ১লা মে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩,০০,০০০ শ্রমিক তাদের কাজ ফেলে রাস্তায় নেমে আসে। শিকাগোতে শ্রমিক ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিক কাজ ফেলে শহরের কেন্দ্রস্থলে সমবেত হয়। অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা, মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট, বিপ্লবী আন্দোলনের হুমকি সবকিছু মিলে ১লা মে উত্তাল হয়ে ওঠে। পার্সনস, স্যাম ফিলডেন, জোয়ান মোস্ট, অগাস্ট স্পাইজ, লুইস লিংগসহ আরো অনেকেই শ্রমিকদের মাঝে পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে শ্রমিকরা কাজ ফেলে আন্দোলনে যোগ দেয়। আন্দোলনকারী শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখে। ৩রা মে (কারো কারো মতে ৪ঠা মে) ১৮৮৬ সালে সন্ধ্যাবেলা হালকা বৃষ্টির মধ্যে শিকাগোর হে মার্কেট বাণিজ্যিক এলাকায় শ্রমিকগণ মিছিলের উদ্দেশ্যে জড়ো হন। অগাস্ট স্পাইজ জড়ো হওয়া শ্রমিকদের উদ্দেশে কিছু কথা বলছিলেন। হঠাৎ দূরে দাঁড়ানো পুলিশ দলের কাছে এক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এতে এক পুলিশ নিহত হয় এবং ১১ জন আহত হয়, পরে আরো ৬ জন মারা যায়। পুলিশবাহিনীও শ্রমিকদের ওপর অতর্কিতে হামলা শুরু করে, যা সাথে সাথেই রায়টের রূপ নেয়। রায়টে ১১ জন শ্রমিক শহিদ হন। পুলিশ হত্যা মামলায় পার্সন, ফিসার, অ্যাঞ্জেল, অগাস্ট স্পাইজসহ ৮ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। ১৮৮৬ সালের ৯ই অক্টোবর বিচারের রায়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। কিন্তু এ রায় মেনে নিতে পারেননি শ্রমিক নেতাদের পরিবার। তারা রায়ের প্রতিবাদ করলেন, মিছিল ও সমাবেশ করলেন, বক্তৃতা দিলেন। দেশ-বিদেশের সরকারের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু তাদের প্রতিবাদ কোনো কাজে এল না এবং শ্রমিক নেতাদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হলো না বরং আবেদন অগৃহীত হয়ে ফাঁসির রায় অব্যাহত রইল। শ্রমিক নেতাদের দেখার জন্য তাদের পরিবারের সদস্যদেরও কোনো সুযোগ দেওয়া হলো না। এক প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর উন্মুক্ত স্থানে ৬ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। লুইস লিংগ একদিন পূর্বেই কারাভ্যন্তরে আত্মহত্যা করেন, অন্য একজনের পনেরো বছরের কারাদণ্ড হয়। ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের পূর্বে অগাস্ট স্পাইজ বলেছিলেন, 'আজ আমাদের এই নিঃশব্দতা, তোমাদের আওয়াজ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হবে'। ২৬শে জুন, ১৮৯৩ ইলিনয়ের গভর্নর অভিযুক্ত আট জনকেই নিরাপরাধ বলে ঘোষণা দেয় এবং রায়টের হুকুম প্রদানকারী পুলিশের কমান্ডারকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। আর অজ্ঞাত সেই বোমা বিস্ফোরণকারীর পরিচয় কখনোই প্রকাশ পায়নি।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা মে দিবস

শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের 'দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার' দাবি অফিসিয়াল স্বীকৃতি পায়। শ্রমিক নেতাদের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মে দিবসকে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে ১৮৯০ সাল থেকে প্রতিবছরের ১লা মে বিশ্বব্যাপী পালন হয়ে আসছে 'মে দিবস' বা 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস'। ১৮৯০ সালের ১৪ই জুলাই অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে' ১লা মে শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং তখন থেকে অনেক দেশে দিনটি শ্রমিক শ্রেণি কর্তৃক উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। রাশিয়াসহ পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পর মে দিবস এক বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে। জাতিসংঘে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শাখা হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের অধিকারসমূহ স্বীকৃতি লাভ করে এবং সকল দেশে শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের তা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

বিশ্বব্যাপী মে দিবস উদ্‌যাপন

১৮৮৯ সালের প্যারিস সম্মেলনে স্বীকৃতির পর থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মে দিবস উদ্‌যাপন শুরু হয়। ১৮৯০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের হাউড পার্কে বিশাল সমারোহে উদ্‌যাপন করা হয় প্রথম আন্তর্জাতিক মে দিবস। যুক্তরাষ্ট্রেও প্রথম মে দিবস পালন করা হয় একই বছর। ফ্রান্সে দিবসটি পালন করা হয় শ্রমিকদের বিশাল মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে। রাশিয়ায় প্রথম ১৮৯৬ সালে এবং চীনে ১৯২৪ সালে আন্তর্জাতিক মে দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরে এই রীতি ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি মহাদেশে। বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও ওশেনিয়া মহাদেশের প্রায় প্রতিটি উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত ছোটোবড়ো সব দেশেই প্রতি বছর পালিত হয় আন্তর্জাতিক মে দিবস।

বাংলাদেশে মে দিবস পালন এবং শ্রমিকদের বাস্তবতা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল এবং আইএলও কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। এই দেশে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা অনেক। শ্রমিক দিবসের প্রেরণা থেকে বাংলাদেশ মোটেও পিছিয়ে নেই। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের শাসন থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে মে দিবস পালিত হয়। ঐ বছর সদ্য স্বাধীন দেশে পহেলা মে সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। তারপর থেকে আজও পহেলা মে সরকারি ছুটির দিন বহাল আছে। এদিন শ্রমিকরা মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পালন করে মে দিবস। তারা তাদের পূর্বসূরিদের স্মরণে আয়োজন করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। শ্রমিক সংগঠনগুলো মে দিবসে আয়োজন করে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমুখী কর্মসূচির। বাংলাদেশের শ্রমিকরা এদিন তাদের নিয়মিত কাজ থেকে সাময়িক অব্যাহতি পেয়ে থাকে। আনন্দঘন পরিবেশে তারা উদ্‌যাপন করে মহান মে দিবস। বিভিন্ন সংগঠনও দিনটি পালন করে থাকে। এদিন দেশের সকল প্রচারমাধ্যম ও পত্রপত্রিকায় শ্রমিকদের পক্ষে সভা-সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়।

প্রতিবছর মে দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা একদিকে যেমন তাদের অধিকার আদায়ের রক্তাক্ত ইতিহাসকে স্মরণ করে তেমনি স্বপ্ন দেখে তাদের অধিকারের ষোলোআনা প্রাপ্তির। বাংলাদেশের শ্রমিকরাও নিঃসন্দেহে এর বাহিরে নয়। তবে দেশে দেশে এখনো অসহায়ের মতো শ্রমিকদেরকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সাভারে রানা

প্লাজায় শ্রমিকদের ওপর স্মরণকালের ভয়াবহ ভবন ধসে প্রায় বারো শতাধিক নিরীহ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু পুরো জাতিকে শোকাহত করে। এর পূর্বে ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডের গার্মেন্ট কারখানায় আগুন লেগে ১১১ জন শ্রমিক পুড়ে মারা যান। ২০১০ সালে হামিম গার্মেন্টসহ তিনটি গার্মেন্টে অনেক শ্রমিকের প্রাণ চলে যায়। এসবের অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে শুধুমাত্র কর্মপরিবেশে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে। এভাবে প্রায় প্রতি- বছর বিভিন্ন ফ্যাক্টরিগুলোয় বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এসব দুর্ঘটনায় অনেক নারী-পুরুষ মারা যায়। দুর্ঘটনায় যেসব শ্রমিক মারা যায়, তাদের পরিবারের রুটি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তারা চোখেমুখে অন্ধকার দেখে। আশার কথা হলো, সরকারের নানা পদক্ষেপের ফলে অবস্থার উন্নতি হয়েছে ও হচ্ছে। শ্রমিকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে সরকার ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করে দিয়েছে। শ্রমিক কল্যাণে শ্রমিক-মালিক-সরকার ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। তথাপি শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চায়। এ নিয়ে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব দেখা যায়। তাছাড়া দেশের শ্রমিকদের একটি বড়ো অংশ নারী। এসব নারী বিভিন্ন কলকারখানা, বিশেষ করে গার্মেন্ট শিল্পে বেশি কাজ করে থাকে। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজ করেও তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। অনেকেরই জীবন আবার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। নারী শ্রমিকের নিরাপত্তায় সরকারি নানা পদক্ষেপের পরও কার্যক্ষেত্রে ও গণপরিবহণে নারীর নিরাপত্তা পুরোপুরি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে যেমন বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি নানা সামাজিক সমস্যারও উদ্ভব হচ্ছে।

একজন মানুষের জীবনধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এসবই একজন শ্রমিকের প্রাপ্য। আর এটাই হচ্ছে শ্রমিকের প্রকৃত মর্যাদা। একুশ শতকে এসে বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ নিয়ে আমাদের আরো বেশি কিছু করা জরুরি। কারণ শ্রমিকরা এদেশের সম্পদ। তাদের কারণেই দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে। মহান মে দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। যদিও সময়ের ব্যবধানে শ্রমজীবী মানুষের যান্ত্রিক বিপ্লবের কারণে কাজের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু পরিবর্তন আসেনি শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে।

বাংলাদেশে পোশাক শ্রমিকের বিষয়ে যত কাঠামোগত প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার হয়েছে, অন্যান্য শ্রমিকের ক্ষেত্রে তা একেবারেই হয়নি। নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। এসব ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় যাদের রক্ত ও ঘাম মিশে আছে তারাও তাদের শ্রমের ন্যায্য পাওনা অনেক সময় পায় না। শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং দেশের শ্রম আইনে সংবিধান অনুসারে শ্রমিক শ্রেণির মানুষের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত আছে।

ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন মিল, ফ্যাক্টরি ও ব্রিকফিল্ড শ্রমিকের পর সবচেয়ে বেশি শোষণের শিকার হয় ঘরের গৃহকর্মীরা। বাংলাদেশে গৃহকর্মীর ওপর নানাবিধ নির্যাতনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। শুধু তাই নয়, গৃহকর্মীদের ওপর বর্বর নির্যাতনের পাশাপাশি খুন, ধর্ষণও করা হচ্ছে। মে দিবসে যেভাবে আমরা শ্রমিক অধিকার নিয়ে কথা বলি তার তুলনায় বাস্তবে শ্রমিকের অধিকার ও অর্জন অনেক সীমিত।

মে দিবসের তাৎপর্য

বর্তমান শ্রেণি বৈষম্যহীন সভ্য সমাজের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে মূলত ১৮৮৬ সালের সেই শ্রম আন্দোলন। মে দিবসের জন্ম বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাপকভাবে সমাদৃত। পৃথিবীজুড়ে শ্রমিক আন্দোলন ও মুক্তির সংগ্রামের মহান ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ মে দিবস। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী অমানবিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করার মন্ত্র বিশ্ববাসীকে শিখিয়ে দিয়েছে এই দিবস। এজন্য মে দিবসকে বলা যায় পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে শ্রমিকদের মুক্তি লাভের সনদ। পুঁজিবাদীরা একসময় শ্রমিকদেরকে নিজেদের দাস হিসেবে ব্যবহার করার হীন প্রবণতা প্রকাশ করত। শ্রম বিপ্লবের পর মে দিবস যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করল তখন এই দাস প্রথার বিলুপ্তি ঘটল। মে দিবসের কারণে শ্রমিক শ্রেণির চিন্তা ও চেতনায় বৈপ্লবিক উন্নতির উদয় হয়েছে। শ্রমজীবীরা এর মাধ্যমে এক নতুন জীবন লাভ করল, যা তাদেরকে কিছুটা হলেও স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ করে দিল। তাদের সংগ্রামী চেতনার আলোয় আলোকিত হয়েছে পুরো মানবসমাজ। শ্রমিক শ্রেণির সামনে উন্মোচিত হয়েছে এক নতুন দিগন্ত। শ্রমিক সংহতি ও ঐক্য হয়েছে আরো বেশি দৃঢ় ও মজবুত। মে দিবস সমাজ থেকে দূর করতে সক্ষম হয়েছে কলুষিত ও বিভীষিকাময় অন্ধকার।

মে দিবসের মূল্যায়ন

শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা তাদের কিছু অধিকার অর্জন করলেও সকল দিক থেকে শ্রমিকরা তাদের অধিকার পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। মে দিবস ঘটা করে পালন হলেও শ্রমিকরা আজও অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার। আজও তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত মজুরি নিশ্চিত করতে পারেনি। কর্মক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম হয়তবা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কিন্তু থামেনি শ্রমিক নিপীড়ন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়নি শ্রমিকের প্রকৃত মর্যাদা ও শ্রমের মূল্য। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অহরহ শ্রমিক বিক্ষোভ থেকে আমরা সহজেই এটা অনুধাবন করতে পারি। বেতন বৃদ্ধি কিংবা বকেয়া বেতন আদায়ের নিমিত্তে গার্মেন্ট শ্রমিকরা বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ করে। কাজেই দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, আজও দুনিয়ার কোথাও শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি এবং তাদের বাঁচার উন্নত পরিবেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আইএলও কনভেনশন ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক সংগঠন হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের অধিকারসমূহ স্বীকৃতি লাভ করে। আইএলও শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ পর্যন্ত ১৮৩টি কনভেনশন প্রণয়ন করে। এরমধ্যে ৮টি কোর কনভেনশনসহ ৩৩টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। তাছাড়া দেশে বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী সরকার শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে দায়বদ্ধ।

বাংলাদেশ লেবার ফোর্সের জরিপ অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। এরমধ্যে এক-চতুর্থাংশ মহিলা শ্রমিক।

শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম বদ্ধপরিকর। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবি হজরত আদমই (আ.) শুধু নন, সকল নবি-রাসুল এমনকি আমাদের প্রিয় নবি হজরত মোহাম্মদ (সা.) শ্রমিকের অধিকার ও শ্রম আইনের পথপ্রদর্শক।

❑ মিশকাত শরিফে মহানবি (সা.) শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, 'শ্রমিকদের ঘাম শুকানোর আগেই তাদের মজুরি পরিশোধ করে দাও'।

❑ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের অধীনস্থ লোকেরা তোমাদের ভাই, আল্লাহ যে ভাইকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে তাই খেতে দাও যা তুমি নিজে খাও। তাকে তাই পরিধান করতে দাও যা তুমি নিজে পরিধান কর'। (eyLvwi)

❑ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কেউ তার অধীনস্থকে অন্যায়ভাবে এক দোররা মারলেও কিয়ামতের বিচারের দিনে তার থেকে এর বদলা নেওয়া হবে'। (Zveivwb)

❑ মহানবি (সা.) শ্রমিককে আপনজনের সাথে তুলনা করে বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের আপনজন ও আত্মীয়স্বজনদের সাথে যেমন ব্যবহার কর, তাদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করবে।'

❑ একই কথা মহানবি (সা.) আরেক হাদিসে উল্লেখ করেছেন এভাবে, 'তোমরা অধীনস্থদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদেরকে কোনো রকমের কষ্ট দেবে না। তোমরা কি জান না, তাদেরও তোমাদের মতো একটি হৃদয় আছে। ব্যথা দানে তারা দুঃখিত হয় এবং কষ্টবোধ করে। আরাম ও শান্তি প্রদান করলে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন কর না'। (eyLvwi)

❑ শ্রমিকদের শক্তি-সামর্থ্য ও মানবিক অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখার বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'মজুরদের সাধ্যের অতীত কোনো কাজ করতে তাদের বাধ্য করবে না। অগত্যা যদি তা করাতে হয় তবে নিজে সাহায্য কর।' (eyLvwi)

❑ উমর ইবনে হুরাইস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করিম (সা.) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হালকা কাজ করে নিবে তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও পুণ্য লেখা হবে'।

❑ ইবনে যুবাইর (রা.) বলেন, নবি করিম (সা.) চাকরের সাথে একত্রে বসে খেতে তাগিদ দিয়েছেন।

❑ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, এক ব্যক্তি নবি করিম (সা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) চাকরবাকরকে আমি কতবার ক্ষমা করব? তিনি চুপ রইলেন। সে পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলে এবারো তিনি চুপ রইলেন। সে পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলে এবারো তিনি চুপ রইলেন। চতুর্থবার বলার পর বললেন, দৈনিক সত্তরবার ক্ষমা করবে। (*আবু দাউদ*)

❑ রাসুল (সা.) আরো বলেছেন, 'তোমাদের খাদেম যদি তোমাদের খাদ্য প্রস্তুত করে এবং তা নিয়ে যদি তোমার কাছে আসে, যা রান্না করার সময় আগুনের তাপ ও ধোঁয়া তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে তখন তাকে খাওয়াবে। খানা যদি অল্প হয় তবে তার হাতে এক মুঠো, দু'মুঠো অবশ্যই তুলে দিবে'। (*মুসলিম*)

❑ মালিকের প্রতি শ্রমিককে তার অধিকার নিশ্চিত না করার পরিণাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহানবি (সা.) কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কঠিন অভিযোগ উপস্থাপন করব– যে ব্যক্তি আমার কাউকেও কিছু দান করার ওয়াদা করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল, কোনো মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে যে তার মূল্য আদায় করল এবং যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের কাজে নিযুক্ত করে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নিল, কিন্তু তার মজুরি দিল না–ওরাই সেই তিনজন।' (*মিশকাত*)

❑ হযরত আবুবকর (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, অধীনস্থদের সাথে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (*ইবনে মাযাহ*)

এভাবে ইসলাম শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার যে গ্যারান্টি দিয়েছে তা দুনিয়ার আর কোনো মতবাদ বা দর্শন দেয়নি বা দিতে পারেনি। আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্র দর্শনের কোনোটাই শ্রমিকের প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদার ন্যূনতম সমাধান দিতে পারেনি। ফলে এখনও শ্রমিক-মজুররা নিষ্পেষিত হচ্ছে। মালিকের অসদাচরণ, কম শ্রমমূল্য প্রদান, অনুপযুক্ত কর্মপরিবেশ প্রদানসহ নানা বৈষম্য শ্রমিকের দুর্দশা ও মানবেতর জীবনযাপনের কারণ হয়ে আছে।

নানা আয়োজনে প্রতিবছর শ্রমিক দিবস পালন করার মধ্যে শ্রমিকের প্রকৃত কোনো মুক্তি নেই। যে অধিকারের জন্য শ্রমিকরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন শিকাগোর রাজপথে, তা বাস্তবে এখনও অর্জিত হয়নি। আজও শ্রমিকেরা পায়নি তাদের কাজের উন্নত পরিবেশ, পায়নি ভালোভাবে বেঁচে থাকার মতো মজুরি কাঠামো এবং স্বাভাবিক ও কাঙ্ক্ষিত জীবনের নিশ্চয়তা। মহান মে দিবসকে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রকৃত অর্থে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে বাংলাদেশের শ্রমিক সমাজের পক্ষ থেকে উত্থাপিত দাবিগুলোকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিবেচনাপূর্বক সকলের আন্তরিকতার সাথে ভূমিকা রাখা খুবই জরুরি।

এছাড়া শ্রমঘন শিল্পের মালিকদেরকে শ্রমিকদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার আলোকে তাদেরকে কাজ দিতে হবে। মালিককে অবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, তার নিজের স্বজনরা যেরকম জীবনযাপন করবে, তার অধীনস্থ শ্রমিকরাও সেরকম জীবনের নিশ্চয়তা পাবে। তাছাড়া কোনোভাবেই শ্রমিক সমাজের প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা আদায় সম্ভব হবে না।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

ড. মীজানুর রহমান

বাঙালির স্বাধীন জাতিসত্তা তথা পৃথক জাতি-রাষ্ট্রের চেতনার অন্যতম ভিত্তি যদি বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলনকে ধরে নেওয়া হয় তাহলেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বাঙালির রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে। এর বিরোধীদের মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। তাদের অনেকে আমাদের রাজনীতিতে নেতৃস্থানীয়ও ছিলেন। খাজা নাজিমউদ্দিন ও নুরুল আমিনের নাম সবাই জানলেও ভেতরে ভেতরে তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তাদের ধারণা ছিল সমগ্র পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে তা ইসলাম আর ভূগোলের বিভ্রান্তি নিয়ে সৃষ্ট পাকিস্তানের অখণ্ডতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। তারা বাংলা ও বাঙালিত্বের মধ্যে হিন্দুয়ানির গন্ধ সবসময়ই পেত। যার ফলে দেখা যায়, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রচর্চা নিষিদ্ধ করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে। তারও আগে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধেও এদেশে প্রচুর লোকের অবস্থান ছিল। '৬৬ সালে যখন ছয় দফা ঘোষণা করা হয় তখনও ছয় দফাকে ভারতীয়দের প্ররোচনায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করার লোক এদেশে প্রচুর ছিল। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময়ও আইয়ুবশাহীর পক্ষে এবং '৭০-এর নির্বাচনে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের বিপক্ষে প্রচুর বাঙালি অবস্থান নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় 'পাকিস্তানের সংবিধান ও গণতন্ত্র সমুন্নত' রাখতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও নিপীড়নের সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিল হাজার হাজার আলবদর, রাজাকার। জামায়াতে ইসলামীসহ অনেক রাজনৈতিক দল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করে পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে নেমেছিল। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দুনিয়ার অধিকাংশ দেশই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিরোধিতাকে পরাজিত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে এ জাতি বিজয় অর্জন করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। পরাজিত হয় ১৯৫২, ৫৪, ৬১, ৬৬, ৬৯, ৭০-এর বাঙালি চেতনার বিরুদ্ধাবলম্বনকারী শক্তি। কিছুদিনের জন্য পরাজিত শক্তি চুপচাপই ছিল, কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে পুনরায় ক্ষমতাসীন হয় দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের বিরোধী পক্ষ '৭১-এর পরাজিত শক্তি। আসলে ওই দিন যারা রাষ্ট্রক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে তারা মূলত আবার পূর্ব পাকিস্তানকেই কায়েম করে। পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন হয় আজীবন বাঙালিত্বের বিরোধিতাকারী অপশক্তি। ইতিহাসের চাকা ঘুরতে থাকে পেছনের দিকে। ১৯৭৬ সালের ৩রা মে এক ফরমান জারি করে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোকে পুনর্বাসিত করা হয়। রাজনীতিতে নিয়ে আসা হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বিরোধিতাকারী জামায়াতে ইসলামীকে। ১৯৭৬ সালের ২৮শে জুলাই পিপিআর ঘোষিত হওয়ার পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। যদিও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় আরো দুটি আওয়ামী লীগ তৈরির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সময়ের পরীক্ষায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মূল আওয়ামী লীগই টিকে যায়।

১৯৭৫-এর পর পুরো দেশ চলে যায় পাকিস্তানি ভাবধারার লোকদের দখলে। বাকি থাকল কেবল পতাকা আর মানচিত্রটি। জাতীয় সংগীতটি বদলানোর চেষ্টার ধৃষ্টতাও দেখালেন তারা। ১৯৮১ সালের ১৩-১৪ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে শেখ হাসিনাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সময় ভাগ্যক্রমে বিদেশে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যাওয়া শেখ হাসিনা নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন দিল্লিতে। সভাপতি পদ গ্রহণে শেখ হাসিনাকে রাজি করানো এবং দেশে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগের অংশ হিসেবে দিল্লিতে একাধিক বৈঠকে বসেন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কয়েক দফা বৈঠক হয়।

পাকিস্তানপন্থি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেশব্যাপী প্রচারণা শুরু করে

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা প্রতিরোধের জন্য। তারা সারাদেশে প্রচুর লিফলেট ও হ্যান্ডবিল বিতরণ করে। জয় ও পুতুল জলবসন্তে আক্রান্ত হওয়ায় শেখ হাসিনার ঢাকা প্রত্যাবর্তন কয়েকদিন বিলম্বিত হয়। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দুপুর ১২টায় পুতুলকে নিয়ে ঢাকায় আসেন শেখ হাসিনা। কিছুটা হলেও ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণের মতো। ওইদিন বঙ্গবন্ধুর অবতরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক প্রজাতন্ত্রটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল। ১৭ই মে শেখ হাসিনার ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণের মধ্য দিয়ে যে ভিত্তিকে উপড়ে ফেলার চেষ্টায় নড়বড়ে করে ফেলা হয়েছিল তা পুনঃগ্রথিত হওয়ার যাত্রার শুভসূচনা। শেখ হাসিনাকে পেয়ে বাঙালি তার 'বাঙালিত্ব' ও 'বাংলাদেশকে' ফিরে পাওয়ার আশায় বুক বাঁধল। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয় 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে। জনস্রোতে কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছিল। অনেক ঝুঁকি নিয়েই অবতরণ করেছিল শেখ হাসিনাকে বহনকারী ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানটি। লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়েছিল। গগনবিদারী স্লোগানের মধ্যে বেরিয়ে আসেন সাদা রঙের ওপর কালো ডোরাকাটা তাঁতের মোটা শাড়ি পরা প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তখন কাঁদছিলেন, প্রকৃতিও একই পথ ধরল। চারদিক অন্ধকার হয়ে বৃষ্টি শুরু হলো, সঙ্গে ঝড়ও। ট্রাক এবং মিছিল চলছিল খুব ধীরগতিতে। সেই মিছিলে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মিছিল বনানী কবরস্থান হয়ে মানিক মিয়া এভিনিউতে আসতে তিন ঘণ্টা সময় লাগল। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় যখন শেখ হাসিনা গণসংবর্ধনার মঞ্চে দাঁড়ালেন তখনও প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল কমপক্ষে দশ লক্ষ মানুষ। শেখ হাসিনা কান্নাজড়িত কণ্ঠে আবেগময় ভাষণ দেন। তবে ভাষণে দৃঢ়তার কোনো অভাব ছিল না। আওয়ামী লীগের মতো স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী বৃহৎ সংগঠনটিকে নেতৃত্বদানে যে তিনি নিশ্চিতভাবে সফল হবেন তাঁর বক্তৃতায় সে লক্ষণই পরিলক্ষিত হয়েছিল। তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তিসংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য আমি এসেছি। আমি আওয়ামী লীগের নেত্রী হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই।' তাঁর আগমন গণজোয়ার নিয়ে আসে সারাদেশে। হতাশাগ্রস্ত আওয়ামী লীগ কর্মীরা সুসংগঠিত হতে শুরু করে। বিপন্ন যে জাতি দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল অর্জন হারাতে বসেছিল, তাদের মনে আবারো হারানো মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ফিরে পাওয়ার আশা ফিরে আসে। শুরু হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার আন্দোলনের পথচলা। এরই মধ্যে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানে নিহত হন। ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর বিচারপতি সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সাত্তারকে সরিয়ে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন।

১৯৮৩ সালের শুরুতে আওয়ামী লীগের ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। ৯ই এপ্রিল হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের এক সম্মেলনে শেখ হাসিনা সামরিক শাসনবিরোধী ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৯৮৬ সালের মার্চে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এরশাদবিরোধী আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে কয়েকবার গৃহবন্দি করা হয়। ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার সমাবেশমুখী মিছিলে গুলি চালিয়ে ৩৮ জন নেতাকর্মীকে হত্যা করে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান শেখ হাসিনা।

তাঁর নেতৃত্বে এরশাদবিরোধী আন্দোলন এত বেগবান হয় যে, জরুরি অবস্থা জারি করেও এরশাদ ব্যর্থ হন। সামরিক-বেসামরিক আমলারা পক্ষ ত্যাগ করতে শুরু করেন। ১৯৯০ সালের ৬ই নভেম্বর শেখ হাসিনা পায়ুপথে এক জনসভায় সাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ দেখান। ৬ই ডিসেম্বর সেই রূপরেখা অনুযায়ী এরশাদ শাসনের অবসান হয়। ১৯৯২ সালে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসে উদ্যোগী হন। বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি গঠন করে দলীয় রাজনীতিতে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় মেধার সমাবেশ ঘটান। আওয়ামী লীগ তার ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রেখে আধুনিক মানসিকতার দলে রূপান্তরিত হয়। ঘাতক-দালাল নির্মূল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আওয়ামী লীগ।

শেখ হাসিনা ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে অংশ নেন এবং জয়লাভ করেন। ২৩শে জুন সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাংলার জনগণ তাদের হৃত মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ আবার ফিরে পায়। একমাত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বের দৃঢ়তার কারণেই ২০০৯-পরবর্তী বাংলাদেশে সেনা বা সেনাসমর্থিত শাসনের অবসান হয়। বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্নয়নের মহাসড়কে।

লেখক: উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বকবির আবির্ভাব ও নোবেল অর্জন

মাসুদ আহমেদ

বর্ণমালা বিকশিত হবার তিন হাজার তিনশত বছরের মধ্যে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠশিল্পী, বিশ্বকবি এবং আমাদের সোনার বাংলার দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের লগ্নটি কেমন ছিল তা আমাদের অনেকেরই জানতে ইচ্ছে করে। দেখা যাক কেমন ছিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত। ঝিঁঝিপোকার ডাকে চারদিক মুখরিত। জীর্ণ পাতা আর বাতাসের সংঘর্ষের মর্মর ধ্বনিও স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল। অন্ধকারে জোনাকিরা প্রাণপণ আলো ছড়াচ্ছিল।

এ বাড়ির চারদিক ঘন সবুজ, নিশ্ছিদ্র বনানীর বৃক্ষরাজি দিয়ে ঘেরা। বৈশাখের রুদ্রতাপে দিনটি ক্লান্ত আর অবসন্ন। বাতাস, এমনকি মৃদুমন্দ সমীরণের কোনো আভাস ছিল না গত কদিন ধরে। মিটমিট রেড়ির তেলের প্রদীপের আলোয় এ বিশাল বাড়ির মাত্র দু'একটি প্রকোষ্ঠে জীবনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। পরিবারটির অধিবাসীর সংখ্যা অনেক হলেও তারা প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাবার কিছুক্ষণ পরই। যে গৃহে অপগণ্ড এবং অন্যান্য সন্তানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ইতোমধ্যেই তেরোটি, সে গৃহের কোনো অধিবাসী আর একটি শিশুর জন্মের জন্য রাত জেগে অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গোণে না। তাই এই নীরবতা। তবে জনক-জননীর কথা আলাদা। জননী বৈজ্ঞানিক কারণে জেগেছিলেন। আর জনক স্ত্রী ও সন্তানের অবস্থা জানার জন্য। নবীন নিশীথের অবস্থান তখন নিম্নরূপ:

রেবতী-মীন
শুক্রের দশা ভোগ্য

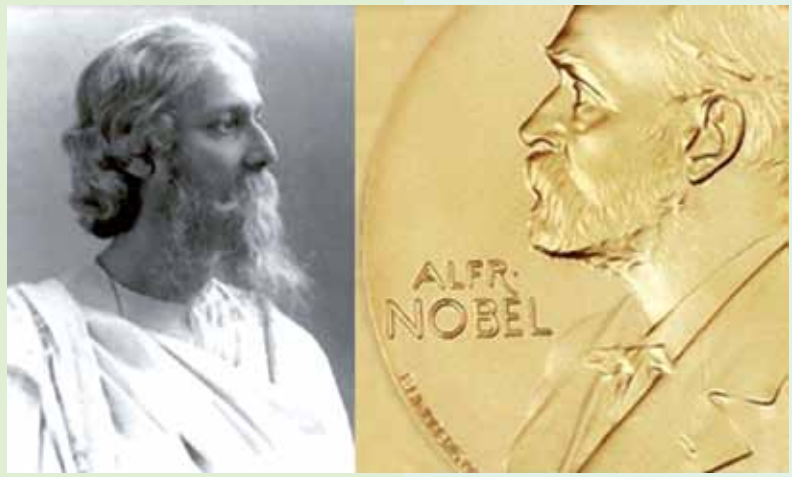

বিশাল এই বসতবাটীখানি দেখলেই অপরিচিত পথিকরা বুঝত এটি অবস্থাসম্পন্ন মানুষদের আবাস। আর যারা পরিচিত ছিল তারা জানত পূজা ও পালাপার্বনে নানা উপঢৌকনের দাক্ষিণ্য এ গৃহ থেকে তাদের প্রতি বর্ষিত হবেই।

রাজার পুত্র না হয়েও যে রাজকুমার হওয়া যায়, ঐ শিরোনামে অভিহিত হওয়া যায়, বর্তমান গৃহস্বামীর পিতা তা প্রমাণ করে গেছেন। সেই রাজকুমারের পুত্র বর্তমান গৃহস্বামী আজ দিনেও একবার সেই কথাটি মনে করেছিলেন। নতুন প্রজন্মের জন্মক্ষণে মানুষ হয়ত পূর্বপুরুষদের নানা কথা মনে করে। জন্ম হলে আবার সেই অতীতের ছায়াপুরুষদের সঙ্গে নবাগত শিশুটির তুলনা করে বলে, 'আদলখানি হয়েছে অমুক দাদুর বা নানুর মতো'।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে তখন একটি মালা গাঁথা হয়ে যায়। নতুন ফুল আর পুরনো মালা গাঁথা এভাবেই চলতে থাকে।

পিতা তাঁর নিজস্ব শয়নকক্ষে অপেক্ষা করছিলেন।

ভারতবর্ষের এই অন্ধকার লোকালয়টি ঐ জনপদের অনেক অংশ থেকে নানাদিক দিয়ে এগিয়ে থাকলেও গর্ভবতী কোনো নারীর সন্তান প্রসবের প্রত্যাশিত তারিখ বলে দেবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তখনো এখানে পৌঁছেনি। তারপরও প্লেগ, উদরাময়, গুটিবসন্ত এবং নানা দুর্ভেদ্য রোগবালাই অতিক্রম করে বিশ কোটি সন্তান সেখানে ভূমিষ্ঠ হয়ে বিচরণ ও জীবনযাপন করছিল।

দোতলা নয়, একতলাও নয়, কাঠের সিঁড়ির পাশে মাঝামাঝি একটি স্থানে তৈরি একখানি কাষ্ঠনির্মিত কক্ষে একজন ধাত্রী এবং মা অপেক্ষা করছিলেন। টিক্ টিক্ শব্দে ঘড়ির পেণ্ডুলাম বেজে চলছে। রাতের তৃতীয় প্রহর। এমন সময় একটি নির্দিষ্ট ধরনের ক্রন্দনের শব্দ গৃহস্বামীর কানে প্রবেশ করল। এ শব্দ পরিবার পরিকল্পনাহীন এই জনপদে অশ্রুতপূর্ব নয়।

তিনি তাঁর কক্ষ থেকে নেমে শব্দের উৎসমুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। পরনে সাদা কৌপিনের বস্ত্র ও শাঁখা হাতে একজন ধাত্রী বাইরে এসে জানালো গৃহস্বামীর চতুর্দশতম সন্তানটি একটু আগেই তাঁর স্ত্রীর কোল আলো করে এ ধরাধামে শুভাগমন ঘটিয়েছে এবং নবাগত শিশুটি একটি পুত্রসন্তান। এ শুভ সংবাদে গৃহস্বামী, দিগম্বরী ওরফে দিগ্‌মী নামের এই বার্তাবাহিকাকে আশীর্বাদ করলেন এবং কালবিলম্ব না করে স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করলেন। তিনি স্ত্রী-পুত্রকে অবলোকন করলেন। সময়টি তখন ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ রাত ২টা ৩৮ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড। তিনি এই তথ্যগুলো নিখুঁতভাবে একটি নোটবুকে লিপিবদ্ধ করলেন। এই লিপিবদ্ধকরণের প্রথাটি এ পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে। শুধু ঘটনা নয়, প্রতিটি আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ভুলভাবে জাবেদা বইতে সঙ্গে সঙ্গে স্থান লাভ করার ব্যবস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে ঐ পরিবারে প্রচলিত ছিল।

এই ঘুমন্তগৃহ এবং ততোধিক ঘুমে মগ্ন পাড়ার এবং গভীর নিশীথাচ্ছন্ন প্রহরেও উলুধ্বনি বাজিয়ে নবীন শিশুটিকে সংবর্ধনা জানানো হলো। এই গুটিকয়েক মানুষ এবং মনুষ্যরচিত আদিম বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি ছাড়াও এই কঙ্কালসার শিশুটি অন্যভাবে এই পৃথিবীতে সংবর্ধিত হলো। যারা তাকে এই স্বাগতম জানালো তারা রাতজাগা পাখি, আকাশের মেঘখণ্ড, বনের বৃক্ষরাজি, কীটপতঙ্গ, পৃথিবীর আর এক প্রান্তে ঘুমিয়ে থাকা চাঁদ, সূর্য, আলোকবর্ষ দূরের নীহারিকা ও তারকারাজি, সমুদ্র ও নদী, বাতাস, পাহাড় এবং মাটি। এদের থেকে কেন এই শুভেচ্ছা, স্বাগতম? সে কথা পরে বলা যাবে।

পৌনে এক শতাব্দীকাল পুরনো এই গৃহে এক অসাধারণ প্রথা কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। তা হলো, শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র স্থান পেত ধাত্রী মায়ের কোলে। নাড়ীছেঁড়া ধনটি যার, সেই গর্ভধারিণী তাকে এমনকি স্তন্যপানও করাতে পারতেন না। প্রাত্যহিক পরিচর্যা, লালন এবং পান মানে স্তন্যপানের মতো একান্ত কাজটিও বেতনভোগী ধাত্রীমাতাই করতে থাকতেন। আজকের জননী ৩৫ বৎসর বয়স্কা সারদা সুন্দরীও ক্ষীণকায়া শিশুটির দিকে একবার মাত্র চোখ মেলে তাকালেন, একটু স্পর্শ করলেন এবং তারপরই তাকে দিগম্বরী'র কাছে স্থানান্তরিত করলেন।

পুরুষশাসিত, তমসাচ্ছন্ন এবং পর্দার ঘেরটোপে জীবনের উদয়াস্ত কাটানো নারীর মনোবেদনা বোঝার চেষ্টা সমাজ তখনো করা শুরু করেনি যদিও সেখানে বিজ্ঞানমনস্ক ইংরেজ শাসনের একশ চার বছর

তখন অতিক্রান্ত।

বাড়িটির পুব পাশে প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট। দক্ষিণে নারিকেল শ্রেণি। তার ফাঁকে একটি পল্লি পুকুর এবং পুকুরের পাশে একখানা গোয়ালঘর। আরো দূরে তরুচূড়ার সঙ্গে মেশানো কলকাতা শহরের নানা আকার ও আয়তনের উঁচু-নীচু ছাদের শ্রেণি। তখনো হুগ্‌লী আর সুতানটীর মাঝখানের এই মহল্লার ছ'নম্বর গলিতে ছিল প্রায় দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল ভদ্রাসন।

ক্রমিক নম্বর দিয়ে মনুষ্য বসতীকে চিহ্নিত করার বুদ্ধি ভারতবাসীর ছিল না। তখন লেফাফার উপর 'গণেশ পণ্ডিত' বা 'অখিল মাস্টার-এর বাড়ি' ঠিকানা লিখে চিঠি লিখলেই তা ঠিকমতো প্রাপকের ঠিকানায় এসে পৌঁছুতো। ক্রমে এই ব্যবস্থা জটিল হয়ে উঠলে ইংরেজরা পৌরসভা এবং খানা নম্বর- এর প্রচলন করেছিল। সেই থেকে এই বাড়িটি ছ'নম্বর গলির বাড়ি হিসেবেই পরিচিত। এটি সহজেই পথিকজনের চোখে পড়ে। এই ভদ্রাসনটিকে পাহারা দিচ্ছে দুদিক থেকে মালিপাড়া, ডোমপাড়া ও গোয়ালপাড়া।

এই ধরাধামে আগত এই নবাগত'র চোখেমুখে বিশেষ কিছু ছিল কি-না তা রাতের প্রায়ন্ধকারে কেউ লক্ষ করার আগেই তাঁর ক্ষুদ্র অধর অনাত্মীয়া এবং নীচু গোষ্ঠীর ধাত্রী মায়ের স্তনে সংযুক্ত হলো। নাড়িপোতা, নিদ্রা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার মধ্যদিয়ে এর জীবনে প্রথম প্রভাতের আলো প্রস্ফুটিত হলো কয়েক ঘন্টা পরই।

তেরো সহোদর ও সহোদরা এবং পিতামাতার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার এবং এই বাড়িতে বসবাসরত সকল নারী ও শিশু এই ক্ষুদ্রকায় নবাগতকে দেখতে আসলো। ধর্মীয় জাতকর্ম ও উপাসনা এর আগেই পালিত হয়েছে। এবার এই দর্শনার্থীরা খই, মুড়ি, নাড়ু, সন্দেশ ও বাতাসা দিয়ে আপ্যায়িত হলো। দিনের আলোয় তাদের অনেকেই এর আগে শিশুটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করেছে। এবার তারা একে একে বিদায় নিলে পিতামাতা বললেন, একটা নাম দেওয়া দরকার। তাদের তেরোজন পুত্র-কন্যার নামও সেই সঙ্গে বিবেচনায় এল। এতগুলো সন্তানের নাম মুখস্থ রাখা এমনকি পিতামাতার পক্ষেও খুব সহজসাধ্য নয়। যাহোক দ্বিজেন্দ্র, হেমেন্দ্র, বীরেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, পুণ্যেন্দ্র, সত্যেন্দ্র ও সোমেন্দ্র নামধারী পুত্রবাহিনীর কথা একে একে মনে করে শিশুর একটি নাম স্থির করা হলো।

তবে বয়োজ্যেষ্ঠ একজন বললেন, ভালো নামটি ধীরেসুস্থে রাখলে অসুবিধা কোথায়? উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেটি হবে। আপাতত স্থির হলো একটি ডাক নাম। সবাই আদর করে শিশুটিকে 'বুজি' নামে ডাকাই মনস্থ করল।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বিশ্বের নানা ভাষা মানবসমাজে নাজিল করেছেন কি-না তা মানুষ কল্পনা করেছে মাত্র, প্রমাণ করতে পারেনি। তবে পিতামাতার চিন্তা করা ভালো নামটি শুনে সেই স্রষ্টা হাসলেন। সে হাসি সন্তুষ্টির। মানুষ যখন বিজ্ঞানের কোনো সূত্র আবিষ্কার করে এবং তা কোটি মানুষের কল্যাণে আসে তখনো স্রষ্টা এই ভেবে এমনিভাবে হাসেন যে, এটির মধ্যদিয়ে মানুষ সৃষ্টি রহস্যের আর একটি দরজা খুলে স্রষ্টার আর একটু কাছে আসলো।

নামকরণের সঙ্গে একটু আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপার আছে। সেই ধকল এই অস্থি-কঙ্কালসার খুদে মানবটি সইতে পারবে কি-না তা ভেবে কিছুদিন অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে হলো। সাত মাস পর উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুটির নাম রাখা হলো রবীন্দ্রনাথ।

এবার ফিরে যাই বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসের সেই হিরন্ময় সন্ধ্যায়, যখন বিশ্বকবিকে পশ্চিমা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মাননার মুকুট পরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেদিন ১৩ই নভেম্বর ১৯১৩, ১৯শে কার্তিক, ১৩২০ বঙ্গাব্দ। প্রচণ্ড শীত। তিমিরাচ্ছন্ন ভারত থেকে অনেক দূরে এবং বিলেত থেকে চার হাজার চারশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এক ছোট্ট দেশ। বছরের ন'মাসই এটি বরফে ঢাকা থাকে। তাই এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা। এই দেশের রাজধানী শহরে তেরো জন প্রবীণ মানুষ তাদের উপর অর্পিত একটি পেশাগত দায়িত্ব পালনের সূত্রে তাঁদের অফিস কক্ষে একটি গোল টেবিলের চারদিকে বসেছিলেন। বিচার বিভাগ না হলেও তাদের কাজ হচ্ছে একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচার করে রায় দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যেই আজকের এই সভা ডাকা হয়েছে। যে বিষয়ে রায় দেওয়া হয় এই বিচারকরাও অনেকেই সুদূর বা নিকট অতীতে এই রায় প্রাপ্ত।

সাধারণত এই বিচারকদের সংখ্যা আঠারো জন হয়ে থাকে। এ রাতে পাঁচটি পদ খালি ছিল। পেশায় এরা কেউ যাজক, কেউ বা সরকারি কর্মচারী, লেখক, আবার কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

আজকের সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন পের হ্যালস্ট্রম। তিনি স্বদেশের প্রথিতযশা কবি। গত বছর অন্য আর একজন সভাপতি ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হওয়াতে ইনি এবার সভাপতি হয়েছেন। তিনি উপস্থিত সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সভার কাজ আরম্ভ করলেন। সভার প্রারম্ভে একটি ভূমিকামূলক বক্তব্য দেওয়ার প্রথা রয়েছে। তাই তিনি বললেন,

'ভদ্র মহোদয়গণ, যে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদানের যোগ্যতা বিচারার্থে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি তার অর্থমূল্য উঁচু বলে নয় বরং সম্মানটি উচ্চতম মর্যাদা ও মহার্ঘ্য এবং তা বিশ্বমানের বলেই মানদণ্ড নির্ধারণে আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। সত্যিকথা বলতে কি, যার নাম আজ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর নামটি অন্তত আমি শুনিনি এবং তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার যে স্বাক্ষর এখানে পেশ করা হয়েছে তার মৌলিকতা নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন আছে। যেহেতু এটি ভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ তাই জানতে চাই এর প্রস্তাবক কে এবং এর মূল্যায়নই বা কে করেছেন। অনুগ্রহ করে তাঁরা বক্তব্য পেশ করুন।

হেইডস্ট্রম নামে একজন সদস্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, মাননীয় সভাপতি, এ বিষয়ে আমি বলতে প্রস্তুত। ভিন্ন ভাষায় রচিত হলেও প্রস্তাবিত পুরস্কার প্রাপকের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করেছেন স্বয়ং লেখক। তবে এই মূল ভাষার সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে আমার প্রতীতি এই যে, ভাষান্তরের ফলে এটি এতটুকু পরিবর্তিত হয়নি। এর মূল বাণী, ভঙ্গী ও সুর একেবারেই মৌলিক রয়ে গেছে। ইংরেজি ভাষার ওপর এই লেখকের দখল এমনি। এবার আসি বক্তব্যে। এই কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে ইউরোপীয় মধ্যযুগের ধর্মগাথার সাদৃশ্য থাকলেও এর বাণী এত শাশ্বত যে তা অব্যর্থ। এর প্রকাশভঙ্গীতে রয়েছে অনাদিকালের অনাড়ম্বর ভাব যা মনকে মুগ্ধ করে দিতে বাধ্য। এর উপমা ও উৎপ্রেক্ষা এত স্বতঃস্ফূর্ত যে, এগুলোকে সাকার করার প্রয়োজন হয় না। এগুলোর উচ্চারণ হওয়া মাত্র মনশ্চক্ষে এগুলোর প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে।'

সভাপতি বললেন, 'প্রস্তাবটি আমি পড়ে দেখেছি। কিন্তু প্রস্তাবক এত সাধারণ ভাষায় এবং সংক্ষেপে এই লেখককে পুরস্কার প্রদানের সুপারিশ করেছেন যে তাতে কোনো জোরালো যুক্তি উপস্থাপিত হয়নি। সামান্য দু'একটি বাক্যের ভিত্তিতে এমন গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনা করা সমীচীন নয় বলে আমি মনে করি।

এরপর তিনি প্রস্তাবকের সুপারিশটি পড়ে শোনালেন। এটি এই পর্ষদের সচিবকে সম্বোধিত।

'মহোদয়,

যুক্তরাজ্যের রাজকীয় সাহিত্যসমাজের একজন ফেলো হিসেবে আমি সাহিত্যে বিবেচ্য পুরস্কার প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করছি।

'এটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

কাজেই আর কোনো সদস্য কিছু বলবেন কি? কারণ আরো তথ্য জানার প্রয়োজন'।

হেইডস্ট্রম বললেন, 'মাননীয় সভাপতি আমার বক্তব্য শেষ হয়নি।

'বেশ বলুন।'

'এই পুরস্কারের মূল্য মাত্র ৮,০০০ পাউন্ড হলেও এর মর্যাদা অমূল্য। সেই আলোকেই সবকিছু বিবেচনা করা হয়েছে। এর প্রস্তাবকের নাম হলো স্টার্জ মুর। তিনি লন্ডনের রয়েল সোসাইটি অব লিটারেচার-এর সদস্য। যিনি এই কমিটির কাছে একান্ত অপরিচিত নন। যাহোক, এই প্রস্তাবের উপর প্রতিবেদন দেবার দায়িত্ব যেহেতু আমার উপর ছিল তাই আমি আরো বলতে চাই যে, এই প্রেমের কবিতাগুলোর মধ্যে আমি সৌন্দর্যের কোনো অভাব দেখতে পাইনি। ইউরোপীয়ান কাব্য মানুষকে যা দিয়েছে এই কাব্যের আবেদন তার চেয়ে বেশি। বস্তুত গেটের পর এমন কাব্য আমরা আর দেখতে পাইনি। কাজেই এই প্রস্তাবনায় অযৌক্তিক বা অতিরঞ্জিত কিছু নেই বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

'আর কারো কোনো বক্তব্য আছে?'

এবার একজন বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একজন প্রাচ্যবিদ। দীর্ঘদিন কলকাতায় বসবাস করে ওখানকার ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রস্তাবিত লেখকের লেখা ও ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন গবেষণাও করেছেন। তাঁর পিতামহ এ দেশের বিখ্যাত কবি ছিলেন। এই বৃদ্ধের নাম ট্যাগনার। তিনি বললেন,

'সভাপতি ও বিচারকমণ্ডলী,

আমি এমন একজন এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম যিনি ঘটনাক্রমে আজকের প্রস্তাবিত ব্যক্তি। তিনি নিরাসক্ত মন নিয়ে বিশ্ব প্রান্তরে চলাফেরা করেছেন। আর মানুষের মনে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন ভাবনার দীপ্তি। যেমন করে উদাসীন সূর্য চলে কালের কক্ষপথে আর তরুর প্রাণমূলে রেখে যায় অগ্নির সম্পদ– স্বাক্ষর দিয়ে দাবি করে না...।'

সভাপতি বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি রচনার গুণের চাইতে রচয়িতার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেশি কথা বলছেন...।'

'মাননীয় সভাপতি,

আমি দুঃখিত। শুধু উপক্রমণিকা হিসেবে ওটুকু বলছিলাম। যাহোক, এবার মূলকথায় আসি। এই কবির লেখা প্রসঙ্গে কবি উইলিয়াম অনূদিত ভাষণটি এখানে স্থান পায়নি বলে কাগজপত্রে দেখতে পাচ্ছি। তবে তার থেকে একটু উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। তিনি এই কবির কাব্য সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমি আমাদের যুগের এমন কোনো মানুষকে জানি না, যিনি ইংরেজি ভাষায় এমন কিছু লিখেছেন যা এই কবির গীতিকাব্যের সঙ্গে তুলনা হতে পারে।

গুণীজনদের ব্যাপারে অন্য মানুষের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক, তাই ওটি উল্লেখ করলাম। আমার কথা এই যে, স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির বিরোধের বদলে সমন্বয় এবং দুঃখের বদলে মিলের বাণী এই কবি যেভাবে তাঁর কবিতায় বিধৃত করেছেন তার তুলনা নেই। ভলতেয়ারের নানা বাণী আর ফরাসীদের সুকুমার বৃত্তি তার হাস্যরস বোধের একেবারে স্বাভাবিক অঙ্গ। অতএব এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য। আমি আরো যোগ করতে চাই যে, এই কবিকে তাঁর মাতৃভাষায় লিখতে এবং বলতে শোনা লোকদের মধ্যে এখানে একমাত্র আমিই আছি। তাঁর নিজের কৃত এই অনুবাদ মূল ভাষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এবং অভিন্ন। বিশ্বব্যাপী মানুষের অনুভূতি প্রকাশের জন্য ভাষা বিভিন্ন হতে পারে না। ইনি সে কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছেন প্রকৃতির মতো স্বাভাবিকতায়।'

'ধন্যবাদ মি. ট্যাগনার। আমরা এ বিষয়ে অন্যান্যদের বক্তব্যও শুনব'।

এরপর হ্যাইডেনস্ট্যাম নামে একজন ইতিহাসবিদ ও ভাষাবিদ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন,

'মহোদয়গণ,

আমি এই কবির লেখা প্রস্তাবিত সাহিত্যকর্মটুকু নিবিড়ভাবে পড়েছি। তাঁর লেখা পড়ে আমি এত গভীরভাবে আপ্লুত হয়েছি যে, এর তুল্য কোনোকিছু গত দু'দশকে পড়েছি বলে মনে করতে পারি না। এ যেন একটা অনাঘ্রাত ঝর্ণাধারা থেকে পানি পান করার মতো অবস্থা। যে পবিত্রতা এবং মহত্ত্ব তাঁর প্রতিটি চিন্তায় গভীরভাবে প্রোথিত তা তাঁর রচনাকে এক অনুপম এবং সুগভীর উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এর আত্মিক ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এত তীব্র যে তাতে জীবনের তুচ্ছতা এবং মলিনতা কোনো স্থানই পায়নি। এই বিশ্বনন্দিত সম্মাননা পাবার যোগ্য কোনো ব্যক্তি যদি কখনো জন্মগ্রহণ করে থাকেন তাহলে ইনিই সেই ব্যক্তি। তাঁকে এই সম্মান দেওয়া আমাদের নিজেদেরও সম্মানিত করা। এই সুযোগ সুবর্ণ এবং এটিকে হারানো চলবে না। ধন্যবাদ।'

সভাপতি নিরাসক্তভাবে এই বক্তব্যটিও শুনলেন। তারপর বললেন,

'আর কারো বক্তব্য আছে কি?'

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

সভাপতি আবার বললেন, 'তাহলে আমি বলি। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, এই কবির মৌলিকত্বের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। দুই. তিনি ইউরোপে অপরিচিত এবং দূর দেশের কবি এবং তাঁর মাতৃভাষাও ইংরেজি নয়। এমনকি সুপারিশকৃত মানুষটির নাম এমন অভূতপূর্ব যে, আমরা কেউ সেটি উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারছি না। তাঁর নামটি এমন জটিল ও কঠিন। আমার মত হচ্ছে এই যে, তিনি যদি এই পুরস্কার পাবার জন্য একান্ত যোগ্য হয়েও থাকেন তাও তিনি আর একবছর অপেক্ষা করতে পারেন। আমাদের কাছে বিবেচনার জন্য ইউরোপের অনেক বেশি পরিচিত প্রার্থীদের নামের লম্বা এক অপেক্ষমান তালিকা রয়েছে।

সভাপতির মন্তব্যে সদস্যদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তবে এরা সবাই ঠান্ডা দেশের মানুষ, উত্তেজনাপ্রবণ নয়। এমনিতে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই পর্ষদ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। প্রতিবছর তাই হয়ে এসেছে।

'তাহলে কি করা যায়?'

একজন সভ্য প্রস্তাব করলেন 'বিষয়টি ভোটে দেওয়া হোক।'

সভাপতির মনোভাব যাই হোক, তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে ভরসা পেলেন না। কারণ অনেকের বক্তব্য তিনি শুনেছেন।

ভোট প্রদান শেষে আজকের সভায় উপস্থিত তেরো জনের ভোট গণনা হলো। কে বিরুদ্ধে দিয়েছেন তা প্রকাশ না পেলেও বোঝা গেল। বারো জনই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

একটু পর পর্ষদের স্থায়ী সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হলো এই খবর পুরস্কার প্রাপকের কাছে দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দিতে। তিনি নথি ঘাঁটা শুরু করলেন। আশ্চর্য প্রাপকের ঠিকানা নেই নথিতে। অনেক কষ্টে ব্রিটিশ কন্সাল-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। এবার ঠিকানা পাওয়া গেল। অসংখ্য ডাক নাম সম্বলিত নথিতে মূল নাম কোনটি তাও প্রাপকের ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই সুইডিশ সচিব ঠিক করতে পারলেন না। কোন নামে টেলিগ্রাম পাঠানো হবে? সংবাদপত্র বা রয়টার্সকেই বা কীভাবে জানানো হবে?

পর্ষদের একজন সদস্য এদেশের শ্রেষ্ঠ কবি গুস্তভ ভারমার, সচিবের কাছে এগিয়ে এসে বললেন,'...এভাবে লিখুন।'

১৯১৩ সালে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নোবেল প্রাইজ প্রদান করা হয়েছে ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। যিনি বুজি ডাকনামে তাঁর দেশে পরিচিত।

লেখক: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ছোটোগল্পকার, ঔপন্যাসিক ও সংগীতশিল্পী

সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ

আফরোজা পারভীন

সভ্যতার সংকট নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার সভ্যতা কী? এক কথায় সভ্যতার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে সভ্যতার একটা অর্থ পাওয়া যায় সভায়াং সাধুঃ ইতি সভ্যঃ। যিনি সভায় সাধু তিনিই সভ্য। তাহলে কথা এসে যায় সভা কী এবং সে সভায় সাধুই বা কে।

সভা বলতে আমরা বুঝি এমন একটা জায়গা যেখানে কিছু লোক সমবেত হয়। যেখানে কিছু লোক বক্তা থাকেন আবার কিছু লোক শ্রোতা। কোনো কোনো সভায় বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে কোনো ব্যবধানের প্রাচীর থাকে না। বক্তাই শ্রোতা আবার শ্রোতাই বক্তা। আবার কোনো কোনো সভায় বক্তার জন্য আসন নির্দিষ্ট থাকে। তিনি বলেন অন্য সকলে শোনে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ধরনের নানান সভা হয়। প্রাচীন গ্রিসে এক ধরনের ছোটো ছোটো সভা হতো, যার নাম 'পালপিট স্পিকিং।' একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সক্রেটিস বলতেন আর সকলে শুনতেন। আবার এমন সভাও হতো যেখানে সক্রেটিস ও শ্রোতাদের মধ্যে বাক্য বিনিময় হতো যাকে আমরা বলি সক্রেটিস ডায়ালেকটিক। তবে সভা যে ধরনেরই হোক না কেন প্রত্যেক সভাতেই কিছু আচরণবিধি থাকে যা প্রত্যেককেই মেনে চলতে হয়। যারা তা মেনে চলেন তারাই প্রকৃত সভ্য। আর আচরণের নিয়ন্ত্রণবিধি মেনে চলার মধ্যদিয়েই উন্মেষ ঘটে সভ্যতার।

এ প্রসঙ্গে কবি গুরু তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, 'সিভিলাইজেশন, যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তাকে বলা হয় সদাচার। অর্থাৎ তা কতকগুলো সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলোর সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদবতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে সভ্যতা হচ্ছে জীবনের সুস্থ বিকাশ, ইতিবাচক উন্মোচন। সৃষ্টির শুরুতে প্রতিকূলতার হাতে মার খেতে খেতে মানুষ বুঝেছিল এমন কিছু উপকরণ চাই যা টিকে থাকার রসদ জোগাবে। সেদিনই রোপিত হয়েছিল সভ্যতার বীজ। আর সেই বীজের জন্মের পথ বেয়ে মানুষ জানতে শিখল বাঁচার মতো বাঁচতে হলে, জীবনকে সুন্দর করতে হলে, একা নয় বাঁচতে হবে যৌথভাবে, অনেককে নিয়ে। প্রকৃতি আর পরিবেশকে জয় করতে হবে ভালোবাসা দিয়ে প্রীতি-প্রেমের বন্ধনে। মানুষ তা করল। সম্পর্ক সৃষ্টি হলো মানুষে মানুষে।

শুরুতে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করেই জীবন চালাতো। কিন্তু একসময় তাদের চেতনায় এই ইচ্ছের উন্মেষ হলো খাদ্য সংগ্রহ নয়, খাদ্য ফলাতে হবে। তারা অবতীর্ণ হলো খাদ্য উৎপাদকের ভূমিকায়। আবিষ্কার করল কৃষিবিদ্যা । তাদের জীবনে প্রবেশ করল সভ্যতা। কৃষির সূত্র ধরে তাদের স্থায়ী ঘর হলো, ঠিকানা হলো, প্রতিবেশী হলো, আত্মীয়স্বজন হলো। প্রতিবেশীরা আস্তে আস্তে দূরে ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে ধীরে ধীরে মানবতা থেকে এল বিশ্বমানবতা। মানবসভ্যতা এল বিজ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে। প্রথম সিঁড়িটি কৃষিবিজ্ঞান। আর এই বিজ্ঞান থেকে এল পরিবহণ, বয়ন এমন কত শিল্প। এল সংগীত, নৃত্য, বাদ্য, চিত্র এসব নন্দনশিল্প। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-শিল্প সব মিলেমিশে মানবসভ্যতা আজ এক পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে যদি আমরা সভ্যতাকে ভাগ করি তাহলে প্রাচ্য হচ্ছে মন্ত্র সভ্যতার ধারক আর পাশ্চাত্য যন্ত্র সভ্যতার। কিন্তু যন্ত্র এখন মন্ত্রের জায়গা দখল করে নিয়েছে। বিজ্ঞানের চাপে মানুষ এখন যন্ত্রমুখী। তাই হৃদয় এখন হৃদযন্ত্র। চলছে হাতে লেখা চিঠির বদলে মেইল, সম্বোধন এসে দাঁড়িয়েছে হাই হ্যালোয়। তাহলে এটাই কি সভ্যতার সংকট? না। এ এক নতুন সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা। সভ্যতার সংকট তখনই দেখা যায় যখন মানবজীবন থেকে মানবতাবোধ হারিয়ে যায়।

যুগে যুগে বারে বারে দেশে দেশে এমন সভ্যতার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। যা দেখে প্রবলভাবে ব্যথিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, হয়েছেন শরাহত। তাই তো তাঁর লেখনি থেকে বেরিয়ে এসেছে সভ্যতার সংকট বিষয়ে এমন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। তিনি তাঁর রচনায় গভীর আস্থা নিয়ে বলেছিলেন, 'ইতিহাসের এক নব অধ্যায় হয়ত আরম্ভ হবে প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে। পৃথিবীতে একটিমাত্র ইতিহাস আছে– মানুষের ইতিহাস। বিশ্বমানবের ঐক্যের আধ্যাত্মিকতায় আত্মচেতনার আবিষ্কারই ব্যক্তিমানবের পক্ষে এ যুগের সবচেয়ে বড়ো আহ্বান।' কবির উক্তি, 'আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানুষের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছে মানুষ।' বলেছেন, 'যখন সব জগতের মহিমাজ্ঞানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যতা নামধারী মানব আদর্শের বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি। অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্য জাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।'

মানবসভ্যতার উপর প্রথম আঘাত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। শক্তির উন্মত্ততা আর লোভের আগ্রাসী থাবা বিশ্বসভ্যতাকে নির্মম আঘাতে জর্জরিত করল। সভ্যতার এই চরম সংকটে হতবাক হয়ে পড়ল বিবেকবান মানুষেরা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। লোভ-লালসা-মৃত্যু-হিংসা- দ্বেষ থেকে বলবান শক্তিমত্ত জাতিরা একটুও শিক্ষা নিল না। এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অগণিত মৃত্যু আর লাশের মিছিলের মাঝে যারা বেঁচে রইল তাদের না ছিল খাদ্য, না ছিল বস্ত্র, না আশ্রয়। লজ্জাহীন সাম্রাজ্যবাদের নির্মমতা সভ্যতাকে করল পদদলিত।

কিন্তু শুধুমাত্র যুদ্ধই সভ্যতার সংকট ঘটায় না। যুদ্ধ একদিনে সৃষ্টি হয় না। ধারাবাহিক লোভ-বঞ্চনা-যন্ত্রণা-লুণ্ঠন এসব কিছুই তো শেষাবধি গড়ায় যুদ্ধ বা বিপর্যয় অবধি। তাই যে-কোনো অনুচিত কাজই সভ্যতার সংকট ঘটায়। যেমন– জমিদার বা রাজা কর্তৃক গরিবের ধন-সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া, জমি দখল, ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানা, মন্দির ভাঙা, মসজিদ জ্বালানো এগুলোও সভ্যতার সংকট।

আবহমানকাল ধরে সংকট নানা আকারে বারে বারে সভ্যতার উপর আঘাত হেনেছে। কবি আঘাত পেয়েছেন। সে আঘাত তীব্র ক্ষোভ আর কঠিন ধিক্কারে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। কবির জীবদ্দশাতেই যেসব বিষয় নিয়ে সভ্যতার সংকট সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়ে একটি সমীক্ষা হয়। সে সমীক্ষার বিবরণ নিম্নরূপ:

১. স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর দ্বারা দেশে দেশে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি ও বহু দেশের বারংবার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মতো ঘটনাবলি। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের উগ্র আত্মপ্রকাশ।

২. শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক সন্ত্রাসবাদ, সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতা তৈরি করা।

৩. দমন-পীড়ন-শোষণ ও লুণ্ঠনের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীগণ কর্তৃক তীব্র বিভীষিকা সঞ্চার ও উপনিবেশবাদের প্রসার।

৪. ন্যাশনালিজমের দ্বারা বিশ্বব্যাপী উগ্র পররাজ্যগ্রাসী মনোভাবের বিস্তার। প্রসঙ্গক্রমে নাৎসিজমের বীভৎসতা প্রচার।

৫. আধুনিক রণসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার তীব্র ইচ্ছা নিয়ে একাধিক যুদ্ধোন্মাদ জাতির অস্ত্রসম্ভার বিস্তারের ও নিজ নিজ রাষ্ট্রকে অসীম শক্তিশালী করে তোলার উদ্যোগ আয়োজন। দুই বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা মানবসভ্যতার চরম সংকট।

৬. অনগ্রসর এবং দুর্বল রাষ্ট্রদের ওপর ষড়যন্ত্রমূলক নির্মম অত্যাচার ও সুকৌশলে তাদের দমিয়ে দিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রস্বার্থ চরিতার্থ করার বিরাট আয়োজন।

৭. ব্রিটিশ রাজশক্তি কর্তৃক ভারতের মতো দুর্বল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িকতার ভেদনীতি ও ধর্মবিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাকে দুর্বলতর করার চেষ্টা।

ইউরোপীয়দের প্রশংসায় একসময় উচ্চকিত ছিলেন কবি। তিনি ভাবতেন, ইউরোপীয়দের রয়েছে সত্য সন্ধানের সততা। তাঁর ধারণা ছিল এ যুগ ইউরোপের সাথে ভারতবর্ষের সহযোগিতার যুগ। কিন্তু পরবর্তীকালে কবি গভীর বিস্ময়ে লক্ষ করেন, ইউরোপীয়দের বাইরে ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকশিখা আলো দেখাবার জন্য নয়, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবার জন্য। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর তিনি শান্তিনিকেতনে তাঁর সাপ্তাহিক উপাসনায় বললেন, 'সমস্ত ইউরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল? অনেক দিন থেকে।'

বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার পরদিন তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করলেন, 'স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে রিপুর আঘাতে আহত হয়ে মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে।...বিনাশ থেকে রক্ষা করো।' ১৯৩৫ সালে ইতালি আফ্রিকার ইথিওপিয়া আক্রমণ করে। কবি সভ্যতার এই সংকট অন্তর থেকে অনুভব করেন তীব্র বেদনায়। ইথিওপিয়ার ওপর ফ্যাসিবাদের এই আক্রমণে তীব্র বেদনা ও ক্ষোভে কবি ১৯৩৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি লেখেন 'আফ্রিকা' কবিতাটি। সভ্যতা বিস্তারের নামে আফ্রিকাবাসীর শান্ত সবুজ আনন্দময় জীবনের উপর যে বঞ্চনার রক্তাক্ত ইতিহাস পশ্চিমারা অঙ্কন করেছে তার প্রতিবাদে কবি আফ্রিকাকে এক কালো মানবীরূপে চিত্রিত করলেন তাঁর কবিতায়। ঔপনিবেশিকতা কীভাবে আফ্রিকা মহাদেশের মাটির নিচের ধনরত্ন ইউরোপীয় দেশগুলোতে পাচার করছে সেই নির্মম সত্য ইতিহাস, সেই লুণ্ঠনের কাহিনি 'আফ্রিকা' কবিতায় জীবন্ত হয়ে উঠল। সত্যি কথা এই যে, ব্রিটেন, পর্তুগিজ, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম সবাই নেকড়ের তীক্ষ্ণ নখর বিস্তৃত করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আফ্রিকার উপর। সম্রাট হাইলে সেলাসিকে কবিতাটি ইংরেজিতে তরজমা করে দেওয়া হয়। উগান্ডার প্রিন্স নিয়াবোঙ্গের উদ্যোগে কবিতাটিকে সোয়াহিলি ও বান্টু ভাষায় অনুবাদ করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিলি করা হয়। কবিগুরুর এই কবিতা ফ্যাসিবাদের নির্লজ্জ অমানুষিকতার বিরুদ্ধে বেদনার অক্ষরে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ ও আফ্রিকায়।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো ১৯৩৬ সালে যখন স্পেনের গণতন্ত্র ধ্বংস করলেন তখনও কবি তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯৩৯ সালের ৩০শে নভেম্বর রাশিয়া ফিনল্যান্ড আক্রমণ করে। কবি তখনও হেলসিংকিতে বোমাবর্ষণ সমর্থন করেননি। দারুণ মর্মাহত হয়ে কবি লিখলেন,

'ফিনল্যান্ড চূর্ণ হল / সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।'

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হিটলার শাসিত জার্মানি চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে। তারপর আক্রমণ করে পোল্যান্ড। এরপর ইউরোপের সব রাষ্ট্রই একে একে তার করতলগত হয়। হিটলারের সঙ্গে হাত মেলায় ইতালির মুসোলিনি ও জাপানের তোজো। যুদ্ধের শুরুতে হিটলারের সাথে স্টালিনের মিত্রতা এবং যুগপৎ পোল্যান্ড আক্রমণ দারুণভাবে ব্যথিত করে কবিকে। হিটলারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ মিশিয়ে কবি লিখলেন,

'ঐ শোনা যায় রেডিওতে
বোঁচা গোঁফের হুমকি,
দেশ বিদেশে শহর গ্রামে
গলা কাটার ধুম কি!'

এ ছাড়াও গভীর অন্তর্বেদনায় উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্য বিধির ভিত।'

যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশেষত দুই বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতার বিরুদ্ধে কবি বরাবরই সরব ছিলেন। ১৯৪০ সালের মে মাসে অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে কবি লিখলেন,

'তুমি জানো আমার অনেক কবিতা দুর্যোগের ফসল। দুর্দিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ আমার কলমের স্বভাব– সে চেম্বারলেনের ছাতার বাঁটে তৈরি নয়। লক্ষ্মীর চেলারা দুঃসময়ের কাছে ভেবড়ে যায়, কিন্তু সরস্বতীর চেলা তাকে ডিঙিয়ে যায় কিংবা তার ফুটোয় ফুটোয় বাঁশির আওয়াজ তুলে উদ্বিগ্ন হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ডুবিয়ে দিতে থাকে। আজ এই খানিকক্ষণ হল সূর্যের আলো পরিণত শিমুলের তুলোর মতো ফেটে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশে আকাশে একটা দুশ্চিন্তার কালিমা লেপে গিয়েছিল– সেটাকে মুছতে আরম্ভ করেছে।'

পরাধীনতা, দাসত্ব কবির চোখে সভ্যতার চরম অপমান। মানবতার প্রতি সুতীব্র কষাঘাত। শুধু ভারত বা আফ্রিকা নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন রোডেশিয়া বোর্নিওতেও শক্তিমত্ত পশ্চিমারা তাদের করাল থাবা বিস্তার করেছে। বণিকের বেশে দুর্বল দেশে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে ওই দেশে নিজেদের শাসন কায়েম করেছে। দুর্বল দেশকে কুক্ষীগত করে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছে। করেছে নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কবি সর্বদাই ছিলেন সোচ্চার যা আগেই বলেছি। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গ আইনের বিরুদ্ধে কবি লিখলেন কবিতা, অসংখ্য গান। ১৯০৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড স্তম্ভিত করে দেয় বিশ্বের বিবেকবান মানুষকে। ভূলুণ্ঠিত হয় সভ্যতার ইতিহাস। অসংখ্য নিরীহ ভারতীয়ের রক্তে রঞ্জিত হয় জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি। এটা ছিল শুধুমাত্র হত্যার জন্যই হত্যা। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কোনো প্রতিবাদ করেনি পশ্চিমা বিশ্ব। কিন্তু প্রতিবাদ করেছে একজন মানুষ, একজন রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজ প্রদত্ত 'স্যার' উপাধি তিনি পরিত্যাগ করেন এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। তিনি প্রতিবাদী হলেন, পাশে দাঁড়ালেন সারা বিশ্বের অসহায় মানুষের। হয়ে উঠলেন বিশ্বমানবতার নিত্যসঙ্গী।

যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, হত্যা-লুণ্ঠন আগ্রাসনের মহোৎসব চলেছে, তুঙ্গে উঠেছে সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মান্ধতা। কিন্তু এতকিছুর পরও কবি কোনোদিন সমগ্র মানবজাতির পূর্ণ মনুষ্যবোধের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। তিনি জানতেন মানবজাতির ইতিহাসের গতিপথ থেমে থাকবে না। তাকে কালচক্ররথে অতীত থেকে বর্তমানে আসতে হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ অভিমুখে অগ্রসর হতে হবে। অতীতের দুঃস্বপ্ন পার করে যেমন আমরা বর্তমানে এসেছি তেমনি দুঃসহ বর্তমানকেও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সভ্যতার এই প্রেমের পথ, মৈত্রীর পথ, ভ্রাতৃত্বের পথ, শান্তির পথ কখনোও অবরুদ্ধ হবার নয়। সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদের পথ হিংসার পথ। হিংসা কখনো জয়যুক্ত হয় না। সভ্যতা টিকে আছে, টিকে থাকে মৃত্যুঞ্জয় এক শক্তিতে। ঝড়ঝাপটাতে তা সাময়িকভাবে বিপদগ্রস্ত হয় তবে প্রাণে মরে না। এই অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস এ পৃথিবীর অগণিত অশিক্ষিত ভাষাহীন ভীরু ক্ষুধার্ত মানুষ। এ বিশ্বের নিয়ন্ত্রণে যাদের কোনো ক্ষমতা নেই। তারা সভ্যতার নিভু নিভু শিখাটি বাঁচিয়ে রাখে বর্বরতার দমকা বাতাস থেকে। আর আছেন যুগে যুগে আবির্ভূত মহামানবেরা। তারা কেউ শিল্পী, কেউ দার্শনিক, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত্যিক, কেউ ধর্ম প্রবক্তা। কনফুসিয়াস, শ্রী চৈতন্য, নানক, রমা রোঁলা, তলস্তয়, বার্নার্ড শ, লেনিন, গান্ধী– এরা প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে আছেন অকম্পিত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে। তার নাম মানবপ্রেম। এদের উপদেশ, এদের বাণী থেকে বিশ্বমানব সংকটে খুঁজে পায় পথের দিশা।

এদেরই একজন রবীন্দ্রনাথ। যিনি সকল প্রকার লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, ক্ষমতামত্ততা, জাতিবিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, ভেদবুদ্ধির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে প্রকাশ করেন তপস্যার বাণী, 'আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে– এখানে সর্বদেশ, সর্ব জাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা– তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি স্খলন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।'

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কবি আস্থা রেখে গেছেন মানুষের প্রতি। তাই ফিনিক্স পাখিসুলভ অমরতাবোধে উদ্দীপ্ত কবি বলেছিলেন, 'ধরণীর বুকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির অক্ষয়ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে এবং মানবতার জয় হইবে।'

লেখক: সাবেক যুগ্মসচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইতিহাসের আলোকে মে দিবস

সুহৃদ সরকার

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে শ্রমই সব সময় নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। প্রকৃতিতে যা কিছু সম্পদ ও বস্তু তার সবকিছু মানুষ কাজে লাগিয়েছে তার জীবনমান উন্নয়নে এবং অধিকতর ভোগবিলাসের প্রয়োজনে। আর তা করতে গিয়ে মানবসমাজের একটি শ্রেণি আরেকটি শ্রেণিকে ব্যবহার করেছে শ্রমদাস হিসেবে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের পতনের পর শ্রেণিহীন সমাজ ভেঙে যায়। সৃষ্টি হয় দাস সমাজ। দাস সমাজের অভ্যন্তরে দেখা যায় দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণির। এর একটি দাস মালিক আর একটি দাস শ্রেণি। দাস মালিকরা দাসদের শ্রম ফাঁকি দিয়ে তাদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করেছে।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১লা মে ২০১৮ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ-এ মহান মে দিবস উপলক্ষে জাতীয় শ্রমিক জোট, বাংলাদেশ-এর শ্রমিক সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিলে নেতৃত্ব দেন–পিআইডি

এমনিভাবে সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরে শ্রম দাসত্ব এসেছে নতুন নতুন কায়দায়। নতুন নতুন উৎপাদনের হাতিয়ার দিয়ে অধিকতর উৎপাদনে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়েছে শ্রমদাসদের। নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার শ্রমিক শ্রেণিকে নিয়ে গেছে নতুন নতুন ফাঁদের ভেতর।

সামন্ত সমাজের অভ্যন্তরে শিল্প বিকাশের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় পুঁজিবাদী সমাজ। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব আরো প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। শ্রমদাসত্বের শৃঙ্খলটি হয়ে ওঠে আরো বেশি নির্মম, আরো বেশি খোলামেলা। ফলে মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বটা আরো বেশি প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরেই।

পুঁজিবাদী বিকাশের প্রারম্ভিক সময় থেকে শ্রমিক শ্রেণিকে অধিকাংশ দেশে এক নাগাড়ে ১০ থেকে ১৬ ঘণ্টা শ্রম দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আমেরিকায় কাজের সময় ছিল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। চৌদ্দ, ষোলো এমনকি আঠারো ঘণ্টাও কাজের সময় প্রচলিত ছিল তখন। ১৮০৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায় ধর্মঘটরত জুতা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। সে সময় জানা যায় যে, উনিশ থেকে কুড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত খাটানো হচ্ছিল শ্রমিকদের।

১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে লাগাতার ধর্মঘট হয়। এই সময় বিভিন্ন শিল্পকারখানায় দশ ঘণ্টা শ্রমদিনের প্রচলনের দাবি তোলা হয়। পৃথিবীর প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকরা ১৮৪২ সালে। এই সময় গৃহনির্মাণ শিল্পের শ্রমিকরা দশ ঘণ্টা কাজের দাবি তোলে। ১৮৩৪ সালে নিউইয়র্কের রুটি কারখানায় শ্রমিকদের ধর্মঘট চলার সময় *ওয়ার্কিং মেমস অ্যাডভোকেট* নামক পত্রিকার খবর থেকে জানা যায়, মিশরে যে কৃতদাস প্রথা চালু আছে তার চাইতেও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে রুটি কারখানার শ্রমিকরা বছরের পর বছর কাটিয়ে থাকেন।

দশ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন আমেরিকায় দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এরই এক পর্যায়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ভ্যান ব্যুরেনের আমলে সরকারি কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য দশ ঘণ্টা কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এই আইন কার্যকর করার দাবিতে আন্দোলন বেগবান হতে থাকে সর্বত্রই। কয়েকটি শিল্পকারখানায় এই আইন কার্যকর হওয়ায় শ্রমিকরা আট ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৮৫০ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে শ্রমিকরা। উদীয়মান পুঁজিবাদী দেশসমূহেও শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। সেই সাথে গড়ে ট্রেড ইউনিয়ন। অস্ট্রেলিয়ায়ও শ্রমিক আন্দোলনের হাওয়া লাগে। সেখানে 'আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা আমোদপ্রমোদ, আট ঘণ্টা বিশ্রাম'-এর দাবি ওঠে। এই দাবি সে দেশের শ্রমিক শ্রেণি আদায় করে নিতে সক্ষম হয়।

১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে জেনেভায় মার্কসবাদের জনক কার্ল মার্কস এবং অ্যাঞ্জেলসের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণির প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবি প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয়, একে সারাবিশ্বের শ্রমিক দাবি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর পূর্বে এই দাবিতে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণি সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আট ঘণ্টা শ্রম সমিতি গড়ে তোলে। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের পূর্বে ১৮৬১–৬২ সালের দিকে বেশ কিছু জাতীয় ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়ে যায়। সোল্ডারদের ইউনিয়ন, মেসিনিস্ট এবং ব্লাকস্মিথদের ইউনিয়ন এগুলোর মধ্যে অন্যতম। গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সংগঠনগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি সংগঠন একত্রিত করে ফেডারেশন গড়ার অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। এরই এক পর্যায়ে ১৮৬৬ সালের ২০শে আগস্ট ৬০টি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি বাল্টিমোরে মিলিত হয়ে গঠন করে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন। জাতীয় ইউনিয়ন গড়ার প্রধান কারিগর ছিলেন ঢালাই শ্রমিকদের নেতা উইলিয়াম এইচ মিলভিস।

ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন গঠনকল্পে আহূত সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয় তা ছিল এরকম– এই দেশের শ্রমিককে পুঁজিবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই মুহূর্তের প্রথম ও প্রধান করণীয় হলো এমন একটি আইন পাস করা যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যেই সাধারণ কাজের দিন হবে আট ঘণ্টা। এই মহান লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করছি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার। শিল্পে নিয়োজিত শ্রেণিগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিনিধিত্ব করার সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্যক্তিদের নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এই সম্মেলনে।

১৮৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা আইন পাস করে। ঠিক এই সময় ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি উইলিয়াম কাজ বন্ধ রেখে ধর্মঘটে অংশ নেন। বিপরীতে শিকাগোর বুর্জোয়া শ্রেণি শ্রমিকদের ধর্মঘট ও শান্তিপূর্ণ মিছিলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। সকল ধরনের হুমকিধামকিকে উপেক্ষা করে শ্রমিকরা তাদের ঐক্য-সংহতি বজায় রেখে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শিকাগো মিশিগান এভিনিউ চত্বরে হাজার হাজার শ্রমিক এক জমায়েতে মিলিত হয়। ৩রা মে ম্যাককমিক রিপার কারখানায় এক শ্রমিক সভায় শ্রমিকরা প্রথমে দালাল ও হামলাকারীদের মোকাবিলা করে। এরপর মুহূর্তে পুলিশের গুলিতে ৬ জন শ্রমিক নিহত হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৪ঠা মে হে মার্কেটে এক বিশাল শ্রমিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই শ্রমিক সভায় একে একে শ্রমিক নেতা অগাস্ট স্পাইজ, সাম ফিলডেন ও পার্সনদের বক্তৃতা শেষে একটি বোমার আওয়াজে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে সভাস্থল। সাথে সাথে কারখানার মালিকের পেটোরাবাহিনীর উপর্যুপরি গুলিতে চারজন শ্রমিক নিহত ও অসংখ্য শ্রমিক আহত হয়। এ ঘটনায় সাতজন পুলিশও নিহত হয়। বিচার নামের প্রহসনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক নেতা স্পাইজ, পার্সন, ফিসার ও অ্যাঞ্জেলকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শ্রমিক শ্রেণির দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শিকাগোর শহিদ ও আন্দোলনকারী শ্রমিকদের সম্মানে দুনিয়াব্যাপী ১লা মে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৯৩ সালের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক জুরিখ কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির সনদ কমিউনিস্ট মেনুফেস্টোর অন্যতম প্রণেতা অ্যাঞ্জেলসের উপস্থিতিতে ওই প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়। ৮ ঘণ্টার দাবিতে ১লা মে যে শ্রমিক সমাবেশ হয় তা শ্রমিকশ্রেণির সুদৃঢ় অঙ্গীকার। এই সংকল্প হলো সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণি বৈষম্যের বিলোপসাধন করা। এভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার এইচ সিলভিস মাত্র ৪১ বছর বয়সে মারা যান। তার মৃত্যুর পরপরই এই সংগঠনটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। থমকে যায় ৮ ঘণ্টা শ্রম সময়ের দাবি।

ইতোমধ্যে সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস ও অ্যাঞ্জেলস তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সারসংকলন করে প্রকাশ করেন কমিউনিস্ট ইশতাহার। তারা বলেন, শ্রমিকশ্রেণিকে শুধু অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিষয়টিকেও তাদের আওতায় রাখতে হবে। প্রথম আন্তর্জাতিকের পথ ধরে ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ১৮৭০ সালের ১৮ই মার্চ। বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে এ ক্ষমতা দখল প্যারি কমিউন বলে খ্যাত। এই কমিউনের ৭১ দিনের মাথায় ফ্রান্স সরকারের আক্রমণে শ্রমিকশ্রেণি পরাজয় ও বীরোচিত মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৭৪ সালে নিউইয়র্কের টমকিন স্কোয়ারে এক শ্রমিক জনসভায় পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ১৮৭৫ সালে পেনসিলভেনিয়া অঞ্চলের কয়লা খনির মালিকেরা জোরপূর্বক শ্রমিকদের সংগঠন উচ্ছেদের চেষ্টা করে। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে ১০ জন শ্রমিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। ১৮৭৭ সালে ইস্পাত কারখানার লাখ লাখ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ নেয়। শাসকশ্রেণি অত্যন্ত নির্মমভাবে এই আন্দোলন দমন করে। এর ফলে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি আরো বেগবান হয়ে ওঠে। জন সুইনটন নামের একজন সাংবাদিক একটি সাপ্তাহিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিকে ব্যাপক প্রচারে নিয়ে আসেন।

১৮৭২ সালে লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে প্রথম আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হলে এর অস্তিত্ব লোপ পায়, আবার পুনর্গঠিত হয় আন্তর্জাতিক। ২য় আন্তর্জাতিকের জন্ম হয় ১৮৮৯ সালে প্যারিসে। ১৮৮৪ সালের ৭ই অক্টোবরে গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার শ্রমিকদের মিলিত সংগঠন আমেরিকান 'ফেডারেশন অব লেবার'-এর চতুর্থ সম্মেলনে ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবিতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। এই দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরের তিন লাখ শ্রমিক তাদের কারখানার কাজ ফেলে বিক্ষোভের মাধ্যমে সব জাতির শান্তি ও আন্তর্জাতিক শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে।

৮ ঘণ্টা শ্রম দিবস ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে ১৮৮৬ সালের সেই দুনিয়া কাঁপানো সংগ্রামের পর ১৩২ বছর পার হয়ে গেছে। আজও পৃথিবী শ্রম দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। কোনো কোনো দেশে শ্রমঘণ্টা ৮ ঘণ্টা বেঁধে দিলেও তা কার্যকর হচ্ছে না। সেই সাথে শ্রমিকদের ওপরে আছে অমানবিক আচরণ ও সীমাহীন শ্রম শোষণ। মে দিবসের ইতিহাসের সারকথা লুকিয়ে আছে শ্রমিকশ্রেণির সুদৃঢ় ঐক্য ও সংহতিকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে শ্রমিকশ্রেণির দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করার ভেতর।

সেই সাথে মে দিবস আমাদেরকে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যকার ইস্পাতকঠিন ঐক্যের ব্যাপারে যেমন শিক্ষা দেয়, তেমনি শিক্ষা দেয় নীতিতে অটল থেকে শ্রেণির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এগিয়ে যেতে।

লেখক: কবি ও সাহিত্যিক

কোথায় নেই তিনি

আইয়ুব হোসেন

কোথায় নেই তিনি, কোথায় না পাই তাঁকে! ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল অন্দরে-কন্দরে পাওয়া যায়। তাঁকে একান্তভাবে প্রত্যাশাও করা যায়। মিত্র হয়ে দেখা দেন তিনি। পথ প্রদর্শনের ভূমিকা পালন করেন। তিনি যে আমাদের লোক–এই পরিচয় নিয়ে সজীব থাকতে চেয়েছেন। এই পরিচয়টাই বস্তুত মূর্ত করেছেন বলে সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি অনুভূত হয়।

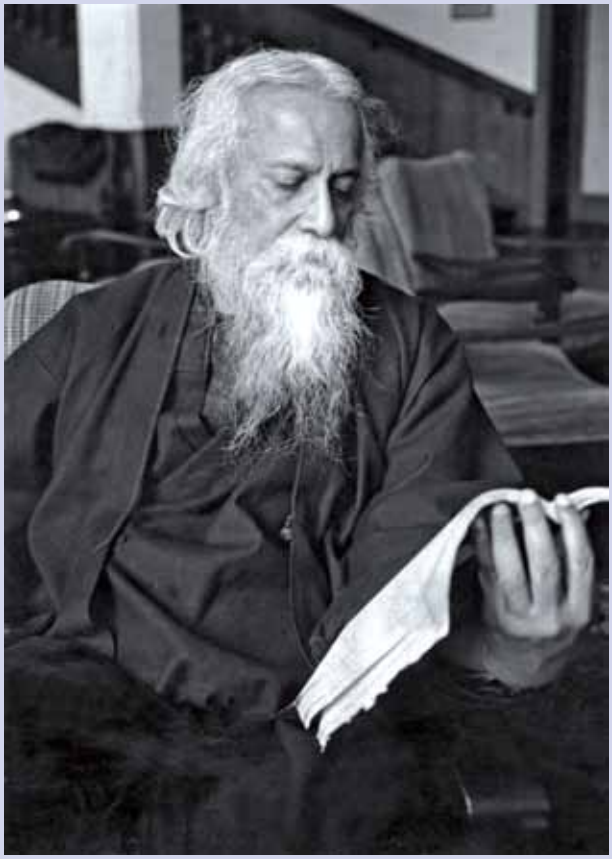

বাঙালি জাতিসত্তার বরেণ্য এই মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে। কিন্তু তাঁর চিন্তা ও মননে ঔপনিবেশিকতার জড়তা ছিল না এতটুকু। বরং রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা তো বটেই, সেই সাথে ব্যক্তি ও সমাজের অধীনতার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। বন্ধন তাঁকে পীড়িত করেছে। মানুষকে তিনি ভালোবেসেছেন অকৃত্রিম আন্তরিকতায়। তাই পরাধীন ভারতের মানুষকে তিনি একইসঙ্গে মুক্ত ও পূর্ণ করতে চেয়েছেন। অশুভকে তিনি জানতেন জীবনবিরোধী বলে। তাই শুভের কামনা করেছেন। তিনি সমাজে সাম্প্রদায়িকতা দেখেছেন, ফ্যাসিবাদের উত্থান দেখেছেন। রাষ্ট্রে দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ। স্বদেশে সীমাহীন অভাব-অভিযোগ দেখেছেন। সুন্দর ও মনোহর প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করেছেন সাধারণ মানুষের জীবনে। কিন্তু হতাশ হননি কখনো। আশাবাদী থেকে আশাবাদের কথা শুনিয়েছেন মানুষকে।

রবীন্দ্রনাথ পরাধীন সময়ে ও ভূখণ্ডে জন্ম নিয়েও ইউরোপীয় রেনেসাঁর আদর্শবাদকে ধারণ করেছিলেন। তিনি নিজের কালের হয়েও শেষ বিচারে তিনি সর্বকালের। সেকালের হয়েও একালের। সর্বদাই আসলে তিনি সমকালীন। এখানেই তাঁর বিশালতা। নির্ণয় করা যায় তাঁর উচ্চতা। অসামান্যরূপে বহুমুখী তিনি। বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার ভরে দিয়েছেন। ছবি এঁকেছেন। গান লিখেছেন, গেয়েছেন। নাটক, কবিতা, গীতিকবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছড়া– সব মাধ্যমে সমান অবদান। মানুষকে তিনি পরিপূর্ণরূপে দেখতে চেয়েছেন। দেখাতেও চেয়েছেন। মানুষের ভেতরের একাংশের সাথে অপরাংশের সংযোগ ঘটাতে চেয়েছেন। ব্যক্তিমানুষকে সামাজিক মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চেয়েছেন।

বাঙালি মনীষার অনিবার্য মিত্র হতে পেরেছেন তাঁর জীবন ও সমাজ সম্পর্কিত মৌলিক চিন্তার জন্য। সমাজের এক ধরনের বৈপ্লবিক সংস্কার কামনা করেছেন তিনি। সমাজের প্রচলিত জীবনবিরোধী প্রথা গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। সংস্কারটাও তো আসলে পরিবর্তনের শামিল। এই সামাজিক পরিবর্তনে তিনি ছিলেন কৃত সংকল্প। সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর মৌলিক চিন্তা নিবিষ্ট হয়েছে। ধর্মীয় জাতপাতকে আক্রমণ করেছেন। সন্ত্রাসবাদকে ঘৃণা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতাকে ছুড়ে ফেলেছেন। বাংলারই আরেক ক্ষণজন্মা মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তিনি ভেবেছেন, সর্বজনীন রূপরেখা নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে একটা সময় পর্যন্ত দুর্বলতার সাক্ষ্য পাওয়া গেলেও ইংরেজ শাসকদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। এদেশের কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নের জন্য তাঁর মনোযোগের কমতি ছিল না। কৃষির একটা পদ্ধতিগত সংস্কার কামনা, তাঁর মৌলিক চিন্তারই পরিচয়বাহী। কৃষিতে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। জমিদারি পরিচালনার বাস্তব জ্ঞান থেকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কৃষিতে সমবায় প্রথা ব্যতীত পল্লির শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি সমবায় কৃষি গড়ে তুলতে না পারলে এদেশের মানুষের অন্নের অভাব ঘুচবে না। এজন্য তিনি নিজ ছেলে ও জামাতাকে সুদূর বিলেতে পাঠিয়েছিলেন ব্যবহারিক জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য। ছেলে রথীন্দ্রনাথ কৃষিবিজ্ঞানী হয়েছিলেন।

রবীন্দ্র সাহিত্য তাঁর কালের যেমনি, তেমনি আবার একালেরও। তেমনি সর্বকালেরও। প্রভাতের যেমনি, তেমনি দিন, সাঁঝ বা নিশিথেরও। অকৃত্রিম রূপ, সুষমা পল্লি-প্রান্তরের যেমন, তেমনি কোলাহলময় নগর সীমানারও। সম্পন্ন ধনীর যেমন, তেমনি নির্ধনেরও বৈকি! রবীন্দ্রনাথ বস্তুত সকলের। সকল বাঙালির। বাঙালির সকল প্রয়াসে, সকল নির্মিতিতে, সকল অবদানেই।

বাঙালির এই বড়ো মিত্রকে একদা এই দেশে, তৎকালীন পূর্ব বাংলায় খণ্ডিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিল। খণ্ডিত বললেও ভুল বলা হবে। বর্জন করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিল সে সময়কার পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি এবং তাদের এদেশীয় দোসররা। সাম্প্রদায়িক কূপমণ্ডুকতায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা রবীন্দ্র-বর্জনের ধুয়া তুলেছিল। দ্বিজাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক আবহে সৃষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও তারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ অনুপ্রবিষ্ট করার তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের অপতৎপরতায় নিয়োজিত হয়েছিল তারা। রবীন্দ্রনাথকে তারা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিরোধী বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর- সাধক ও প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শানুসারী বলে অভিহিত করে সে সময় সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রস্তাবগুলো হলো–

১. পাকিস্তানের ইসলামভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে অখণ্ড ভারত ও রাম রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব

পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে চালু করার জন্য এক শ্রেণির তথাকথিত সংস্কৃতিসেবী প্রদেশব্যাপী যে সাংস্কৃতিক অপচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, এই সভা তাহাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে।

২. পাকিস্তানের বদৌলতে অকল্পিত সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়াও যাহারা বিজাতীয় কৃষ্টি ও মতবাদের তল্পী বয়ে বেড়াইতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট বিকাইয়া দেওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছে তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য এই সভা প্রত্যেক দেশাত্মবোধসম্পন্ন পাকিস্তানি ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের বেতার কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন একাডেমিকে বিজাতীয় সংগীত ও সাহিত্যের অভিশাপমুক্ত করিয়া জাতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের অনুসারী করার জন্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিশু ও কিশোর মনকে জাতীয় কৃষ্টির অনুবর্তী করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে যাবতীয় গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এই সভা পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শে বিশ্বাসী সরকার, সুধী সমাজ ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে। (দৈনিক আজাদ, ৮ মে ১৯৬১: সংগ্রহ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন: সাঈদ-উর-রহমান)।

পাকিস্তানবাদী এদেশীয় কতিপয় বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্র বর্জনের এই ঘৃণ্য তৎপরতায় শামিল হয়েছিলেন। এরা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের নামে উদ্ভট ও অবাস্তব এক জাতীয়তার তত্ত্ব দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে পরিচালিত এই নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডে পাকিস্তানি সামরিক সরকার যতটা না তৎপর ছিল তার চাইতে অনেক বেশি তৎপরতা প্রদর্শন করেছিল এদেশের হাতে- গোনা এক বুদ্ধিজীবী চক্র। সরকারি প্রচারমাধ্যম রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে এই দালাল বুদ্ধিজীবী ও সংগীত শিল্পীরা এক বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতির ভাষা এরূপ–

'পাকিস্তান এছলামী আদর্শ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট কর্মসূচি লইয়া দুনিয়ার বুকে জন্মলাভ করিয়াছে। আমরা পাকিস্তানিরা তাই স্বকীয় তাহজীব তমুদ্দনের পরিপন্থি কোনো প্রচেষ্টাই বরদাশত করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বহু সংগীতে মুসলিম তমুদ্দনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সংগীতের আবর্জনা হইতে রেডিও-টেলিভিশিনকে পবিত্র রাখা প্রয়োজন ছিল। তাই বিলম্বে হইলেও সরকার এই সংগীত পরিবেশন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া জনগণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। আমরা সরকারের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।' (দৈনিক আজাদ, ১লা জুলাই ১৯৬৭, সংগ্রহ পূর্বোক্ত)। রবীন্দ্র বর্জনের এই হীন চেষ্টা অচিরেই স্তব্ধ হয়ে যায়। পূর্ব বাংলার সচেতন সমাজ এর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষে ফেটে পড়ে এবং দুর্নিবার আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রথমে ১৯ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে সরকারি এই সিদ্ধান্তকে দুঃখজনক বলে আখ্যায়িত করে বলেন–

'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের কাছে সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে।' (দৈনিক আজাদ, ২৮শে জুন ১৯৬৭, সংগ্রহ পূর্বোক্ত)। এই আন্দোলনে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীসহ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। আন্দোলনের তীব্রতায় সন্ত্রস্ত সরকার রবীন্দ্র বর্জনের ধৃষ্টতা পরিহার করে।

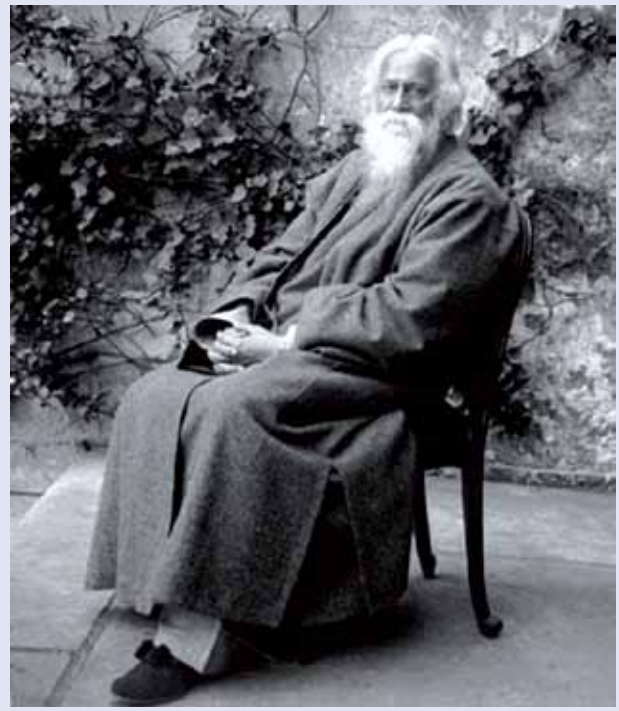

এতো গেল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলে রবীন্দ্র বিরোধিতার চালচিত্র। তাদের জন্য এই তৎপরতার সংগত কারণ হয়ত ছিল। আমাদের লোকটিকে, নিকট জনটিকে, বড়ো মিত্রটিকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কার্যকারণ তাদের ভাবধারার উপাদানের সঙ্গে যুক্ত ছিল বৈকি! কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে! একদল সংস্কৃতিসেবী রবীন্দ্রভক্ত এমনভাবে তাঁকে আগলে রাখতে চান যেন রবীন্দ্রনাথ কেবল তাদেরই জন্য। রবীন্দ্রনাথ সকলের নয়। সাধারণ মানুষের নয়। চিহ্নিত সমাজের পরিচিত কতিপয়ের সম্পদ মাত্র। ভাবখানা এমন, সকলের জন্য নন তিনি। সকলে বুঝবেন না তাঁকে। হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা রাখেন না সকলে। নিজেদের অধিকারের নাগাল থেকে এরা রবীন্দ্রনাথকে মুক্ত করতে নারাজ। রবীন্দ্রচর্চার একচ্ছত্র মালিকানা বিস্তার করে আহ্লাদিত হন তারা। আমাদের লোকটিকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে বিভোর। সাধারণের লোকটিকে সাধারণের কাছ থেকে সরিয়ে রাখার এই মনোভাবও আসলে অন্ধভক্তির আড়ালে এক ধরনের কূপমণ্ডূকতাই। যা রবীন্দ্র-বিরোধিতারই শামিল শেষ বিচারে।

রবীন্দ্রনাথকে সামগ্রিকভাবে লাভ করে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ব্যাপকতার পরিসরে নির্বিচারতার অবদান রসে সিক্ত হতে হবে। সাধারণ্যে তাঁর চর্চার প্রসার ঘটাতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচিকে বাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে, সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে এই বর্জন এবং অন্ধভক্তি–দুয়ের কবল থেকে রবীন্দ্রনাথকে অবমুক্ত করতে হবে। যথাযথ রবীন্দ্রচর্চায় সাধারণের বড়ো মিত্রটিকে সাধারণের নৈকট্যে আনতে দুই-ই প্রায় সমান বিপদ। বর্জন তৎপরতাকে যেমন সমূলে বর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি অতি গ্রাহ্যতার নিগড় থেকেও বের করে এনে তাঁর পরিচয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়ও গ্রহণ করতে হবে যথার্থ রবীন্দ্রপ্রেমীদের।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

স্বদেশে ফিরে এলেন শেখ হাসিনা

শামস সাইদ

শেখ হাসিনা একটা জেদ নিয়ে স্বদেশে ফিরেছিলেন। সেটা পিতামাতা, ভাই-ভাবি হত্যার বিচার নয়, দেশকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে আসার জন্য। গভীরভাবে তিনি উপলব্ধি করতেন জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে যে অর্থনীতি তা আসতে পারে কেবল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়েই। তিনি বলেছিলেন, আমার রাজনীতি হচ্ছে জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আমরা তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করতে চাই। যেখানে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণ এক মানবেতর জীবনযাপন করে। ১৭ই মে ১৯৮১। দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে দেশে ফেরেন শেখ হাসিনা। ছয় বছর আগে যেদিন বিদেশে গিয়েছিলেন সেদিন বাবা-মা-ভাই-ভাবি সবাইকে রেখে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে আর তাঁদের দেখা পেলেন না।

আওয়ামী লীগের ১৯৮১ সালের সম্মেলনে দলের সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর দুই শিশু সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে ছোটো বোন শেখ রেহানার কাছে রেখে এদেশে গণতন্ত্র আর প্রগতিশীলতার রাজনীতি ফেরাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফিরে আসেন শেখ হাসিনা। সেদিন প্রকৃতিও ছিল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। দিনটি ছিল রোববার। ছিল কালবৈশাখির হাওয়া, বেগ ছিল ঘণ্টায় ৬৫ মাইল। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আর দুর্যোগও সেদিন গতিরোধ করতে পারেনি গণতন্ত্রকামী লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল। গ্রামগঞ্জ-শহর-নগর-বন্দর থেকে অধিকারবঞ্চিত মুক্তিপাগল জনতা ছুটে এসেছিল রাজধানী ঢাকায়, অপেক্ষা করছিল কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে, তাদের একমাত্র আশার প্রদীপ বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকারী শেখ হাসিনাকে বরণ করতে। তাকিয়েছিলেন আকাশের দিকে। কখন নেমে আসবে শেখ হাসিনাকে বহন করা বিমান। বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে বিমানবন্দরে কোনো নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মুষলধারার বৃষ্টিবাদল উপেক্ষা করে তারা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন 'নেত্রী'র জন্য। অবশেষে বিকাল ৪টায় কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে নেমে আসে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ৭৩৭ বোয়িং বিমান। জনসমুদ্রের জোয়ারে এসে পৌঁছেন শেখ হাসিনা। দীর্ঘ ছয় বছর পর পা রাখেন দেশের মাটিতে। তাঁকে একনজর দেখার জন্য কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শেরেবাংলা নগর পর্যন্ত সড়ক রূপ নিয়েছিল জনসমুদ্রে।

তাঁর আগমন উপলক্ষে স্বাধীনতার অমর স্লোগান 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে প্রকম্পিত ছিল ঢাকার আকাশ-বাতাস। জনতার কণ্ঠে বজ্র নিনাদে ঘোষিত হয়েছিল 'হাসিনা তোমায় কথা দিলাম– পিতৃ হত্যার বদলা নেব'। সেদিন অবিরাম মুষলধারে বারি বর্ষণে যেন ধুয়ে-মুছে যাচ্ছিল বাংলার মাটিতে পিতৃ হত্যার জমাট বাঁধা পাপ আর কলঙ্কের চিহ্ন। পুরো ঢাকা রূপ নিয়েছিল মিছিলের শহরে। প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল স্লোগানে স্লোগানে।

সেদিন শেরেবাংলা নগরে মানিক মিয়া এভিনিউতে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিমানবন্দর থেকে শেরেবাংলা নগর ঢেকে যায় জনসমুদ্রে। কুর্মিটোলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত ট্রাফিক বন্ধ ছিল প্রায় ছয় ঘণ্টা। জনগণকে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তাঁকে একটা ট্রাকে দাঁড় করিয়ে আনা হয়। বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী যখন মঞ্চে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন তখন এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শেখ হাসিনা এসে দাঁড়ালেন বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে। স্মৃতির বেদনায় বার বার তিনি ভেঙে পড়েন কান্নায়। বলেছিলেন, 'আমি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করে দিতে চাই। আমার আর কিছুই চাওয়া-পাওয়ার নাই। সব হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের পাশে থেকে বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য'। যখন কথাগুলো বলছিলেন তখন চারদিকে নিস্তব্ধতা, তাঁর চোখ দিয়ে অনর্গল জল গড়িয়ে পড়ছিল এবং বৃষ্টির পানিতে মিশে কোটি মানুষের চোখের জলের সঙ্গে এক হয়ে বাংলার মাটি সিক্ত করেছিল। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা যাঁর বুকে গুলি চালানোর সাহস পায়নি, তাঁকেই হত্যা করল বাঙালি মিলিটারি নামের কতগুলো পাকিস্তানি হারমাদ।

'আমি আওয়ামী লীগের নেতা হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের কন্যা হিসেবে, বোন হিসেবে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে আমি চিরবঞ্চিত মানুষের পাশে থাকতে এসেছি। বাবা-মা-ভাই সব হারিয়েছি। আমার ছোটো ভাইটি বুলেটের আঘাত থেকে মুক্তি পায়নি। আমার কেউ নাই। আজ আপনারাই আমার পরম আত্মীয়। স্বামী-সংসার-ছেলে রেখে তাই আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিয়ে আগামী দিনের সংগ্রামে নামতে চাই। মৃত্যুকে ভয় করি না। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের সংগ্রাম আমাদের চলবেই। বিপন্ন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আজ

মুক্তিযোদ্ধাদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটা উচিত। বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করেছিলেন। আমি সেই পথ ধরে চলতে চাই। আদর্শের জন্য মরাও পুণ্যের কাজ'।

বক্তৃতাকালে তিনি বার বার কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন। সেদিন আপ্লুত হয়েছিল লক্ষ জনতা। চোখ মুছে হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে ৬ বছরে অনেকদূর এগিয়ে যেত আমাদের দেশ। এখন আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার জন্ম রাজনৈতিক পরিবারে। আমার রক্তে আছে রাজনীতি। আমাকে রাজনীতিতে আসতেই হবে। কিন্তু এত দ্রুত আসতে হবে, এমন শোকাবহ ঘটনার ভার বুকে নিয়ে আমাকে রাজনীতি করতে হবে ভাবিনি। রাজনীতিই এখন আমার একমাত্র সঙ্গী'।

সভা শেষে পিতামাতাহীন শূন্য বাড়িতে ফিরতে চাইলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু শাসক দলের বাধার কারণে যেতে পারলেন না। আশ্রয় নেন ফুফুর বাসায়। পরদিন গেলেন বনানী কবরস্থানে। যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন মা, চাচা, ভাই, ভাবিরা। মায়ের কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেন মাটিতে। ভেঙে পড়েন কান্নায়। মোনাজাত করেন সবার আত্মার শান্তি কামনা করে। ২০শে মে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করা হয়। সেই সংবর্ধনায় শেখ হাসিনা বলেন, আমি সামান্য মেয়ে। সক্রিয় রাজনীতির দূরে থেকে আমি ঘরসংসার করছিলাম। আপনাদের ডাকে সবকিছু ছেড়ে এসেছি। বাংলার দুঃখী মানুষের সেবায় আমি জীবন বিলিয়ে দিতে চাই।

এছাড়া, গত ৬ বছরে দেশের মানুষের কোনো উন্নতি তো আমি দেখিনি। মানুষ চরম দুর্দশায় নিপতিত হয়েছে। কৃষক- শ্রমিক তার ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষক তার উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মূল্য পাচ্ছে না। তিনি সেদিন উত্তাল জনসমুদ্রের কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, 'তবে কেন বঙ্গবন্ধুকে, শেখ মণি ও চার নেতাকে হত্যা করা হলো'? ৭ই জুন ছয় দফা দিবস উপলক্ষে হোটেল ইডেনে আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন শেখ হাসিনা। ২৩শে জুন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে মাজহারুল ইসলামের বাসায় সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাঁকে।

স্বদেশে ফিরে আসা শেখ হাসিনার জন্য খুব সহজ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা চায়নি তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা বাংলায় ফিরে আসুক। স্বদেশে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তারা চেষ্টা করেছিল তাঁর আগমন বাধাগ্রস্ত করতে। এমনকি 'শেখ হাসিনা প্রতিরোধ কমিটি'ও করেছিল। জনশক্তির সামনে কোনো ষড়যন্ত্র দাঁড়াতে পারেনি। তাই শেখ হাসিনার স্বদেশে ফিরে আসা ঠেকাতে পারেনি কেউ। শেখ হাসিনা যেদিন স্বদেশে ফিরে আসেন সেদিন তিনি যেতে পারেননি হাজারো স্মৃতিবিজড়িত সেই ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে। বলেছিলেন বাড়িটি খুলে দিতে। কিন্তু তৎকালীন সরকার অনুমতি দেয়নি। মিলাদ পড়েছিলেন রাস্তার ওপর বসে। সরকার অন্য বাড়ি দেওয়ার প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল তাঁকে। তা প্রত্যাখ্যান করেন শেখ হাসিনা। ৩০শে মে সরকার প্রধান জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনীর কিছু অফিসারের হাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিহত হন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হলেন বিচারপতি সাত্তার। ১২ই জুন রাষ্ট্রপতি সাত্তার খুলে দিলেন ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট থেকে পরের দীর্ঘ ছয়টি বছর ধূলিধূসরিত জীর্ণশীর্ণ পোড়াবাড়ির মতো দাঁড়িয়েছিল ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটি। কী ঘটেছিল পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে? সেই সময়ের অনেক খবরেরই তথ্য যাচাই করার সুযোগ পাননি সাংবাদিকরা। সবারই একান্ত আগ্রহ ছিল এ বাড়িতে সেদিনের ভয়ংকর রাতে কী ঘটেছিল সেটা দেখার। সাংবাদিকদের জন্য এদিন সকালে বাড়িটি খুলে দেওয়া হয়। শেখ হাসিনা সেদিন সাংবাদিকদের নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকেছিলেন। শেখ হাসিনার সঙ্গে ছিলেন জোহরা তাজউদ্দীন, সাজেদা চৌধুরী, আইভি রহমানসহ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব পর্যায়ের অনেকেই। বাড়ির মধ্যে গাছপালা বেড়ে জঙ্গল হয়ে আছে। মানুষ নাই বহুদিন তার নিদর্শন সর্বত্র। মাকড়সার জাল, ঝুল, ধুলোবালি, পোকামাকড়ে ভরা।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট থেকে একাশির ১৫ই আগস্ট; দীর্ঘ ৬ বছর ধরে এই বাড়ির সবকটি ঘর ছিল তালাবদ্ধ। দরজা খোলার পরে জুতা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সবাই। বাড়িটিতে অনেক শহিদের রক্ত জমাট হয়েছিল তখনও মেঝেতে। দেয়ালে। সিঁড়িতে। জুতা পায়ে কেউই প্রবেশ করতে পারল না। মনে হচ্ছে এ এক পবিত্র স্থান, বাঙালির আত্মত্যাগের প্রতীক শহিদমিনার কিংবা জাতীয় স্মৃতিসৌধ– যা প্রতিষ্ঠায় সারাজীবন ব্যয় করেছেন বঙ্গবন্ধু। সেই বঙ্গবন্ধুর রক্ত এই বাড়িতে। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ছোটোবেলা থেকেই কাজ করত রমা। সেদিন সেই রমা একটি ছোটো টিনের বাক্সে জং-ধরা নানা ধরনের চাবি নিয়ে ঘুরছিল, প্রয়োজনে দরজা খুলে দিচ্ছিল। এই রমাই সেই ভয়াল রাতের হত্যাকা ের একজন সাক্ষী। কোনোরকমে পালিয়ে বেঁচেছিল সে।

বাড়ির ভেতর ঢুকে শেখ হাসিনা ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছেন। এ কী দেখছেন! ঘরগুলো সব অন্ধকার। গুলির আঘাতে লাইব্রেরি ঘরের দরজা ভাঙা। বইয়ের আলমারিতে গুলি, কাচ ভাঙা, বইগুলো বুলেটবিদ্ধ, কয়েকটা বইয়ের ভেতর তখনও বুলেট রয়েছে। একটা বইয়ের নাম kÖ×vÄwj। বইটির ওপরে কবি নজরুলের ছবি। বইটির ভেতরে একটা আগলা ছবি। একজন মুক্তিযোদ্ধার। বুলেটের আঘাতে বইটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধার বুকের ওপর গুলি। এরপর সবাই দেখতে চাচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধু যেখানে নিহত হয়েছেন, সেই স্থানটি। যদি নিচ থেকে যাতায়াতের চলতি সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা যেত, তাহলে প্রথমে চোখে পড়ত সিঁড়ির বাঁক ঘুরেই উপরের সিঁড়ির প্রায় শেষ মাথায় দু-তিন ধাপ আগেই জাতীয় পতাকা বিছিয়ে বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার জায়গাটি পবিত্রভাবে রক্ষিত আছে। কিন্তু তখন সেই পথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রমা বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল। সেদিন কোথায় কী হয়েছিল। এই সিঁড়িতে পড়েছিল বঙ্গবন্ধুর লাশ। সবাই বেরিয়ে গেল বাড়ির পেছনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যাওয়ার জন্য। গেট পেরিয়ে লনের পাশ দিয়ে বারান্দা হয়ে বাঁ-দিকে ছোটো একটা অভ্যর্থনা কক্ষ। সেটা পাশ কাটিয়ে বাঁ-দিকের কাঠের দরজা খুলে গ্যারেজে ঢুকতেই দেখেন আলপনা আঁকা। ছবির মতো সব ভেসে ওঠে শেখ হাসিনার চোখে। কামাল ও জামালের বিয়ের আলপনা। যা এই ঘটনার মাত্র কিছুদিন আগেই হয়েছিল।

আলপনার চারপাশে অদ্ভুত গোলাপি রঙের পানি জমে আছে। সিঁড়ি ধোয়া পানি গড়িয়ে সেখানে এসে মিশেছিল। তখনো বোঝা যাচ্ছিল না এ বাড়িতে কী ভয়ানক দৃশ্য অপেক্ষমাণ। সিঁড়ির বাঁকে চশমার লেন্স ভাঙা, গুঁড়ো শেলের টুকরো পড়েছিল। উপরের দিকে তাকিয়েই সবার রক্তে সেদিন শিহরণ জেগেছিল। শেখ হাসিনা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সামনে যেতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে দোতলায় গেলেন। তাঁর মনে অনেক স্মৃতি জেগে উঠল। বাইরের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন ভেতরের তা বলীলার চিহ্ন। দরজা খুলতেই একরাশ গরম হাওয়া মুখে ঝাপটা মারল। একটা ছোটো শোকেসে ভাঙাচোরা নানা জিনিসপত্র। বাঁ-দিকে রঙিন মাছের অ্যাকুরিয়ামে মরে যাওয়া মাছ, মেঝেতে ধূলির আস্তরণ, সমস্ত দেয়ালে ধ্বংসের চিহ্ন, মায়ের ঘরের আলমারির সব জিনিস বিছানার ওপর স্তূপ করা। ঘরের মেঝেতে গুলির আঘাত। মায়ের ঘরেই সেদিন খুকি-জামাল-রোজি-রাসেলকে গুলি করে। মা দাঁড়িয়েছিলেন দরজায়। সেখানেই তাঁকে গুলি করে। আব্বার বিছানার পাশের টেবিলটায় তখনও রক্তের ছোপ শুকিয়ে ছিল। পূর্ব দিকের দেয়ালজুড়ে রক্তের দাগ। ছাদের উপর মাথার ঘিলু ও গোছা গোছা চুল সব লেগে আছে। এই ঘরটায় হত্যাকারীরা নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। উঁকি দিলেন দোতলার সিঁড়িতে। যেখানে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। সেখানে এখনও রক্ত শুকিয়ে আছে। গেলেন জামালের ঘরে। বাথরুমে বড়ো আয়নাটা গুলির আঘাতে গর্ত হয়ে আছে। জামালের

ঘরের বিছানা ও বালিশ গুলির আঘাতে ফুটো হয়ে গেছে। ছবিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আবার কিছু পোকায় কেটেছে। নিয়েও গেছে অনেক কিছু।

দোতলার বসার ঘরের পশ্চিম পাশের ঘরটা প্যাট্রি ঘরের মতো, সেখানে ইস্ত্রি করার টেবিল। পাশে ডিনার ওয়াগান, কাচের ও রুপার জিনিসপত্র ভরা, উত্তর দিকে একটা সেলফ যেখানে মায়ের হাতের আচারের বৈয়ামগুলো। হাতে নিয়ে দেখলেন মায়ের হাতের আচার। বৈয়াম খুলে দেখলেন আচারের ঘ্রাণ আছে। একটা টিনে কিছু আতপ চাল, সাত বছর পরও চাল তেমনই আছে। মিটসেলফের জিনিসপত্র এবং পাশে একটা আলমারির ভেতর তোয়ালে ও বিছানার চাদর থাকত, ঠিক সেভাবেই আছে। ঘরের মেঝেতে স্তূপীকৃত কাপড়ে ছোপ ছোপ রক্ত। এসব দেখতে দেখতে মনে হয় যেন পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টের নিশুতি রাত এখনো থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন ঘাতকের দল নিচে শেখ কামালকে মেরে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিল। গোলমাল শুনে, গোলাগুলির আওয়াজে বঙ্গবন্ধু সিঁড়িতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। স্বভাবসুলভ কণ্ঠে আঙুল উঁচিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, 'তোমরা কী চাও?' বুলেটের গুলিতে তারা সেই কথার উত্তর দিয়ে চলে যায় ভেতরের দিকে। পড়ে রইলেন বঙ্গবন্ধু, সেখানেই। সিঁড়ির উপরে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে সামনে তাকাতেই চোখে পড়ে বঙ্গবন্ধুর ঘরের দরজা। সেখানে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন বেগম মুজিব। তাঁর পড়ে থাকার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন দৌড়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, পথে কেউ হাতুড়ি দিয়ে তাঁর পা ভেঙে দিয়েছে, এমনই মচকে পা ভাঙা অবস্থায় পড়েছিলেন। হয়ত প্রথমেই তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল। এসব বললেন রমা।

সিঁড়ির সঙ্গেই ডান দিকে শেখ জামালের ঘর, ভেতরে চারকোনা প্যাসেজ। একদিকে শেখ রেহানার ঘর, অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু এবং পাশেই শেখ হাসিনার ঘর। তিনতলায় শেখ কামালের ঘর। দরজায় দাঁড়িয়েই চারপাশের তছনছ অবস্থা, ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন আর স্মৃতির ভারে ভেঙে পড়ছিলেন শেখ হাসিনা। প্রতিটি ঘরের বিছানা, বালিশ, তোশক, আলমারির কাপড়, স্যুটকেসের কাপড় তছনছ করা। ঘরময় তুলা উড়ছিল তখনও। দেয়ালে দেয়ালে উইয়ের বাসা নিশ্চিন্তভাবে বেড়ে চলেছিল। বঙ্গবন্ধুর বড়ো খাটের পাশে টেলিফোন তিনটির তার ছিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ওপাশের দেয়ালে রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়েছিল। আলনায় জায়নামাজটিও নীরব সাক্ষী হয়ে এই হত্যালীলা দেখছিল যেন।

এরপর শেখ হাসিনা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, এ ঘরটি ছিল আমার। আক্রোশে ওরা ঘরের সবকিছু ওলটপালট করেছে। পাশেই এই ঘরটি বাবার। এই ঘরেই মা, ভাই-ভাবিরা একত্রে নিহত হন। বাথরুমে চাচা শেখ নাসেরকে মেরে ফেলে। এরপর এলেন বারান্দায়। এখানে দাঁড়িয়ে প্রায় সময়ই সাক্ষাৎপ্রার্থী জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতেন বঙ্গবন্ধু। প্রতিদিন এখানে অনেক জনসমাগম হতো। ১৪ই আগস্ট সন্ধ্যারাত পর্যন্তও বহু ভিড় ছিল বাড়িতে।

৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে কী ঘটেছিল ১৫ই আগস্ট রাতে, সেকথা জানতে সাধারণ মানুষের সময় লেগেছিল অনেকদিন। কারণ, সাধারণের জন্য এ বাড়িতে প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। মিরপুর রোডের মাথায় ৩২ নম্বর রোডে ঢোকার রাস্তায় যানবাহন চলাচলের অনুমতি ছিল না। পথচলতি মানুষ বাড়িটির কাছে এসে আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত পাহারাদার দেখে বাড়িটির দিকে তাকাতেও ভয় পেত।

এভাবেই একটি পরিবার, একটি দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারের নির্দেশক হয়ে ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটি নির্জন-নীরব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চিরদিন এমন অন্ধকার থাকতে পারে না। তখনই শেখ হাসিনা ভাবলেন, এই বাড়িতে একদিন আলো জ্বালাবেন। সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন বাড়িটা। যেন সবাই জানতে পারে সেদিন কী হয়েছিল এই বাড়িতে। আলো তাই জ্বলছে সেখানে, আবারো শত শত কণ্ঠে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনিত হচ্ছে ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

কিশোর নজরুল
সাহিত্যাঙ্গনের পূর্ব সময়কার কথা

আখতারুল ইসলাম

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত।

কালবৈশাখি রাতের মতোই কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। তিনি বাংলা ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, ২৪শে মে ১৮৯৯ খ্রি. রোজ মঙ্গলবার, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয় পত্নী জাহেদা খাতুনের ৬ষ্ঠ সন্তান ছিলেন নজরুল, তাদের চার-চারটি পুত্রের মৃত্যুর পর কুঁড়েঘরে চাঁদের আলোর মতো নজরুলের আগমন। কষ্টের কুঁড়েঘরে জন্ম বলে হয়ত বাবা-মা দুখু মিয়া বলেই ডাকতেন।

কবি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তা ঐ এলাকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার। তাঁর পিতামহ কাজী আমিন উল্লাহ। নজরুলের ভাইবোন তিনজন, জ্যেষ্ঠ কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠ কাজী আলী হোসেন ও বোন উম্মে কুলসুম। বংশানুক্রমিকভাবে তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ মসজিদের ইমামতি এবং মক্তবে শিক্ষকতা করতেন। নজরুলের বয়স সবে আট। তখন নজরুলকে মক্তবে ভর্তি করালেন। চাচা কাজী বজলে করিমের কাছে পড়েছেন ফারসি ও উর্দু। নজরুল যখন লেখাপড়া শিখে বড়ো হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ঠিক তখন ১৩১৪ সালের ৭ই চৈত্র তাঁর বাবা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু হয়। বাবার মৃত্যুর শূন্যতা, দুঃখের জীবনের সূত্রপাত। ছেদ পড়ে নজরুলের শিক্ষা জীবনে। সুখ নেই, অন্ন নেই, আছে দুঃখ আর অভাব, সংসারের দায়ভার এসে পড়ল নজরুলের কাঁধে। এই বয়সে কোথায় যাবে, কে দিবে চাকরি, শেষ পর্যন্ত ওই মক্তবেই চাকরি। অসাধারণ মেধাবী নজরুল উত্তরাধিকারসূত্রে মক্তবে শিক্ষকতা ও মসজিদের ইমামতি ও হাজী পালোয়ানের মাজারে খাদেমগিরির দায়িত্ব নেন।

সে সময়কার বিখ্যাত লেটো কবি চাচা সৈয়দ বজলে করিম নজরুলকে লেটো কবি চকোর গোদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। নজরুলের মুখে তখন লেটো কবিতার নতুন চরণ, পায়ে ভুবনজয়ী ঘুঙুর। মুখে মুখে গান আর ছড়া বানাতো দুখু। সবার প্রশংসায় রাতারাতি খুদে কবি বনে যায়। তখন অনেক লেটোরদল ছিল, তাঁদের চোখ পড়ল দুখুর ওপর। বলল, গান লেখ আমাদের জন্য। পারলে পালাগানও লেখ। বিনি পয়সায় না, পারলে অল্প কিছু দেব। তিন-চারটা লেটোদলে ডাক পড়ে, ভাব হয়ে যায় সবার সাথে। গান, ছড়া, কবিতা আর পালাগান লিখে যাচ্ছেন। তাতে যা আয় হতো তাতে সংসারের অভাব কিছুটা হলেও দূর হয়। অন্যদিকে ঘরে মা জাহেদার চোখে অশ্রু, তবু বুক ভরা গর্ব।

মক্তবের পর নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় পাস করে কিছুদিন বিরতির পর ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের শেষে শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে ভর্তি হন। অভাবে পড়া হয়নি। শেষে মাথরুন নবীন চন্দ্র ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। বিনা বেতনে ১৯১১-১৯১২ খ্রি. এ দু'বছর লেখাপড়া করেন।

নজরুলের মাথরুন স্কুলের হেডমাস্টার কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক নজরুল সম্পর্কে লিখেছেন–

'আমি ২৩ বছর বয়সে মাথরুন উচ্চ ইংরেজী স্কুলে শিক্ষক হিসাবে ঢুকি... নজরুল সিক্স ক্লাশে পড়তো। ছোট সুন্দর ছন ছনে ছেলেটি, আমি ক্লাশ পরিদর্শন করিতে গেলে সে আগেই প্রণাম করিত। আমি হাসিয়া তাহাকে আদর করিতাম, সে বড় লাজুক ছিল, হেড মাস্টারকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত দেখিত, শিশু কালেই তাহার ব্যবহার ও কথা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্লাশের ছেলেরা ও সকলে তাহাকে ভালবাসিত।' (evsjv mvwn‡Z¨ bRiæj, আজাহার উদ্দিন খান)।

কবি শ্রী কুমুদ রঞ্জন মল্লিক ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে নজরুল সম্পর্কে লিখেন–

কিশোর নজরুল
কিশোর তরুণ তেজস্বী নজরুল
অম্লান, তাজা, টাটকা গোলাপ ফুল
প্রীতি-গীতিময় তাহার বসুন্ধরা,
আগুন এবং আঙুর দিয়ে যে গড়া।

ঐ কবিতাটি লেখার ৫০ বছর আগে কুমুদ রঞ্জন কিশোর নজরুলকে পড়িয়েছেন, তাঁর মনে সে ছবি এমনভাবে জ্বলজ্বল করছিল যে তার কবিতায় তা কত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে!

আর্থিক অনটনের কারণে কবির লেখাপড়ায় বার বার ছেদ পড়ে। তবে থেমে ছিল না লেটোদলের গান। নজরুলের গান শুনে মুগ্ধ হন ট্রেনের গার্ড। তিনি নজরুলকে চাকরি দেন। কাজ হলো রেলস্টেশন থেকে গার্ড সাহেবকে প্রসাদপুরের বাংলোয় পৌঁছে দেওয়া, খাবার আনা ও টুকটাক আরো কাজ। বেশি স্থায়ী হয়নি সে চাকরি। পরে একটা চা-রুটির দোকানে চাকরি পায় দুখু। মাসে বেতন ১ টাকা। খেয়ে না খেয়ে বহু কষ্টে রুটির দোকানে চাকরি করলেও ঘুমাতে হতো সিঁড়ির নিচে। দোকানের পাশে থাকতেন কাজী রফিজ উল্লাহ। পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর। তার স্ত্রী শামসুন্নেসা খানম। তাদের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর সিমলা গ্রামে। ঘুমন্ত দুখুকে একদিন সিঁড়ির নিচে আবিষ্কার করে রফিজ উল্লাহ। রফিজ উল্লাহ দুখুর মুখে শুনেন পারিবারিক কাহিনি এবং নিজ বাড়ি নিয়ে আসেন। এরপর সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে দরিরামপুর হাই স্কুলে দুখুকে ভর্তি করিয়ে দেন সপ্তম শ্রেণিতে ১৯১৪ সালে। নজরুলের বয়স তখন ১৫ বছর। প্রায়ই স্কুলের কাছে ঠুনিভাঙা ঝিলের ধারে বসে বাঁশি বাজাতেন নজরুল। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে নজরুল দ্বিতীয় হন। রেজাল্ট শেষে মায়ের কাছে যান তিনি। কিন্তু ময়মনসিংহে ফিরে আসার নামও নেই তাঁর।

ময়মনসিংহ না ফিরে দুখু পড়ালেখা চালিয়ে নিতে ভর্তি হন রাণীগঞ্জ শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে। দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হওয়ায় দুখু মিয়ার এইটে আর পড়তে হয়নি। এক লাফে ক্লাস নাইনে। মাইনে লাগবে না। থাকবে রায় সাহেবের ফুল বাগানের পাশে মাটির ছোটো ঘরে। খরচের জন্য বৃত্তি পেত রাজবাড়ি থেকে মাসে সাত টাকা।

শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে চারজন শিক্ষক তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতে সতীশচন্দ্র কাঞ্জি লাল, বিপ্লবী ভাবধারায় নিবারণ চন্দ্র ঘটক, ফারসি শিক্ষায় হাফিজ নূরুন্নবী এবং সাহিত্যচর্চায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১৭ সালে নজরুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষা। বিশ্বে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। একদিন রাণীগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে দেখলেন ট্রেনে তাঁর বয়েসি ছেলেরা নানা কথা বলছে, তারা যুদ্ধ বিদ্যা শিখতে যাচ্ছে। একদিন এ দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবে। কয়েকদিন পর দেখা গেল যুদ্ধ চলছে। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ, নজরুল ছুটলেন কলকাতায়, নাম লেখালেন সৈনিকে। তাঁর বন্ধু শৈলও যাবে। কিন্তু বাছাইপর্বে বাদ পড়ে শৈল, নজরুল সৈনিক বেশে যোগ দিলেন উনচল্লিশ নম্বর বাঙালি পল্টনে। এদিকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হলো না। কিন্তু সৈনিক জীবনেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। নজরুল শৈশব থেকেই শারীরিকভাবে সুগঠিত ও পরিশ্রমী। ফলে প্যারেড থেকে শুরু করে প্রচলিত বিভিন্ন অস্ত্র চালনায় পারদর্শী ছিলেন। অল্প সময়ে হাবিলদার থেকে মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হন। করাচিতে সৈনিক জীবনের কিছু সময়, তারপর পেশোয়ার, নওশেরা ও বেলুচিস্তান পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সৈনিক জীবনে কমরেড মুজাফ্ফর আহমদকে চিঠি লিখেছেন– 'সৈনিক জীবন কষ্টের। তার চেয়ে ভালো একটু আধটু লিখি। অন্তত নিজের কাছে তার দাম'। বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবি থাকতেন। একদিন তিনি দেওয়ান-ই-হাফিজের কবিতাগুলো পড়েন। কবিতা শুনে নজরুল এত মুগ্ধ হয়ে যান যে, সেদিন থেকে ওই মৌলবির কাছে ফারসি পড়া শিখতে আরম্ভ করেন। এছাড়া উর্দু ও হিন্দিও চর্চা করেন।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। সৈনিক জীবন শেষে বাংলা সাংস্কৃতিক জগতে নান্দনিকতা ও স্বাধীনতার এক নতুন নকীব হয়ে এলেন নজরুল। প্রবেশ করলেন বাংলা সাহিত্যে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

ঠাকুর পরিবারের ইতিকথা

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি এবং বিশ্বভুবনের অসামান্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙালির জীবনে তিনি চির নতুনের প্রতীক এবং অফুরন্ত সৃজনশীলতার উৎস। বাঙালির সমস্ত আবেগকে তিনি ধারণ করে জীবনকে দেখেছেন। ফলে সাহিত্যের বাইরে তিনি বাঙালির আর্থসামাজিক মুক্তি ও রাজনীতির সরণিতে আলাদা এক রবীন্দ্রনাথ। প্রচণ্ডভাবে তিনি ছিলেন স্বাদেশিক এবং বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধী। আমরা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল বিচরণ নিয়ে কথা বলি, ঢাউস ঢাউস বই লিখি কিন্তু তাঁকে নিয়ে প্রথাগত আলোচনার বাইরে যাই না।

কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে প্রথম দেখেছিলেন সাহিত্যচেতনার মধ্যদিয়ে। এই চেতনাকে ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মানবিক। এ কারণেই বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে মানবাত্মার মুক্তির দর্শনে আরেক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিশাল জীবনকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়, নানা অভিধায় ভূষিত করা যায়। সর্বোপরি তাঁর প্রতিভা আমাদের প্রভাবিত করে। তাঁর আলোয় আমরা আলোকিত হই। তিনি আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী। প্রতিটি মুহূর্তেরও সঙ্গী। এই বাংলাদেশে তাঁর পূর্বপুরুষদের জন্মভিটে, আবার এই দেশেই তিনি পরিবার নিয়ে একটানা দশটি বছর অতিবাহিত করেন। তাঁর সাহিত্য ও সামাজিক জীবনে পূর্ব বাংলার বাস্তবতার চিত্র দৃশ্যমান। সমকালীন জীবন-ভাবনা ও চিন্তা-চেতনা তাঁর রচনায় বিধৃত। সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না বটে কিন্তু সমাজ বিনির্মাণে এই বাংলাদেশে ও শান্তিনিকেতনে তাঁর স্বপ্ন ছিল সুদূরপ্রসারী।

মানবিক অধিকার আদায়ে সারাজীবনই রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। যা কল্যাণকর ও গ্রহণে স্বার্থসিদ্ধি করা যায়, তা-ই তিনি অকাতরে গ্রহণ করেছেন। আবার শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে শাসক প্রদত্ত উপাধি বর্জনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি উপমহাদেশ বিভক্তি দেখেননি। তাঁর প্রয়াণের প্রায় ত্রিশ বছর পর বাংলাদেশের অভ্যুদয়। বঙ্গভঙ্গের সময়ে রচিত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি আমাদের জাতীয় সংগীত। তাঁর ক্ষোভ ও দুঃখবোধ কিছুটা হলেও বাঙালি লাঘব করতে সমর্থ হয়েছে। এভাবে রবীন্দ্রনাথকে চিত্রায়িত করা যায়, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণে আনা যায়। তাঁর কল্যাণ ও মানবধর্মী প্রতিভা হাজার হাজার বছর ধরে প্রভাবিত করবে, আমাদের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে শত শত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে জীবনীগ্রন্থ কম নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেরও তিনখানি আত্মজীবনী রচনা করেছেন। তাহলো ছেলেবেলা, জীবনস্মৃতি ও আত্মপরিচয়। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে জানা যায়, চেনা যায় অতি সহজে। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের নানা চিত্র আমরা খুঁজে পাই এসব গ্রন্থে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কী, ঠাকুর পরিবারের উত্থান ও উৎস খুঁজে পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে না। তাই আমাদের বার বার দ্বারস্থ হতে হয় প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থটির কাছে। এই গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের কাহিনি। অনেক রবীন্দ্রজীবনীকারই রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের পীরালী ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে বলেছেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে পরিবারটি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠেন। কিন্তু পীরালী ব্রাহ্মণের বিষয়টি সবিস্তারে কেউই উল্লেখ করেননি। এমনকি রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন সুকৌশলে। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্রজীবনী রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের পীরালী হওয়া ও জাত খোয়ানোর প্রকৃত ঘটনা বিধৃত করা হয়েছে। এই চিরায়ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে ঠাকুর পরিবারের ঐ কাহিনি পড়ে স্বয়ং কবি ঐ অংশ বইটির পরিশেষে সংযোজন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু লেখক তা করেননি। বইটির সূচনাংশে প্রভাত বাবু সে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

'বর্তমান লেখকের রবীন্দ্রজীবনী প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে

বাংলার কোনো তরুণ সাহিত্যিক ঐ গ্রন্থ ক্রয় করিবেন কি-না তৎসম্বন্ধে আর কাহারও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং কবিরই রায় সংগ্রহ করিতে তাহার জোড়াসাঁকোর বাসভবনে উপস্থিত হন। প্রশ্ন শুনিয়া কবি নাকি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের কাহিনি নহে, উহা দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনি। নবীন লেখকটিকে কবি কী ভাব হইতে ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। তবে গ্রন্থ-মধ্যে ঠাকুর পরিবারের বিস্তৃত আলোচনাংশ পাঠ করিয়া কবি জীবনী-লেখককে ঐ অংশ পরিশিষ্টে সংযোজিত করিবার নির্দেশ দেন। আমাদেরও অনুমান, কবি মনে করিতেন যে, পূর্বপুরুষদের সহিত তাঁহার ব্যবধানটা কেবল কালের দূরত্বের দিক দিয়া নহে, গুণের গুরুত্বের দিক হইতে দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু বস্তু বিচারী ঐতিহাসিকদের নিকট কবির বহুমুখী প্রতিভার অভিব্যক্তির জন্য তাঁহার পূর্বপুরুষদের দোষ ও গুণ সমভাবে দায়ী। প্রতিভার সহিত প্রাকৃতের পার্থক্য যতই গভীর বলিয়া প্রতিভাত হউক, গঙ্গোত্রীর সহিত গঙ্গা সাগরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্যভাবেই যুক্ত। সেই জন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের কাহিনি-পর্বটি অবান্তর জ্ঞানে পরিত্যাগ বা পরিশিষ্টে সংযোজন করিতে পারিলাম না, গঙ্গোত্রী হইতেই আমরা যাত্রা শুরু করিলাম। রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ঠাকুর পরিবারের সহিত গত একশত বছরের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস এমনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে রবীন্দ্রনাথের সর্বোতমুখী প্রতিভার যথার্থ উৎস আবিষ্কার করিতে হইলে সেই বংশের উৎপত্তি ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত এই বংশ এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও শক্তি অর্জন করিয়াছিল, যাহার বলে তাহা এককালে বাংলার বিচিত্র সামাজিক জীবনের শীর্ষস্থানে নিজ অক্ষুণ্ন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং এই পরিবারের ইতিহাস আলোচনা নিরর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।'

এবারে পীরালী ব্রাহ্মণের কাহিনি। ইতিহাস অনুসারে খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে আদিশূরের রাজত্বকালে কান্যকুব্জ থেকে বাংলাদেশে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসেন। এরা হলেন– শাণ্ডিল্য গোত্রের ক্ষিতিশ, বাৎশ্য গোত্রের সুধানিধি, সাবর্ণ গোত্রের সৌভরি, ভরদ্বাজ গোত্রের মেধাতিথি ও কাশ্যপ গোত্রের বীতরাগ। কাশ্যপ গোত্রের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ দক্ষিণানাথের চার পুত্রের মধ্যে কামদেব ও জয়দেব প্রথম যবানদুষ্ট হয়ে পীরালী হন। তখন তারা যশোর জেলার চেংগুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তুর্কি রাজত্বকালে খানজাহান আলী দক্ষিণ বাংলার প্রশাসক। খানজাহান আলীর এক দেওয়ানের নাম তাহের। তাহের পূর্বে ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। তার বাড়ি ছিল নবদ্বীপের পীরল্যা গ্রামে। তিনি এক মুসলিম রমণীর প্রেমে পড়ে মুসলমান হন এবং লোকে তাকে পীরল্যা খাঁ বলে সম্বোধন করত। দেওয়ানি লাভের পর তাহের পূর্বোল্লিখিত কাশ্যপ গোত্রের রঘুপতির পঞ্চম অধস্তন পুরুষ দক্ষিণানাথের দু'পুত্র কামদেব ও জয়দেবকে প্রধান কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেন। জানা যায়, রোজার সময় তাহের বা পীরল্যা খাঁ নেবুর ঘ্রাণ নিলে কামদেব ঠাট্টা করে 'ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয়' একথা বলেন। অর্থাৎ রোজা নষ্ট হয়েছে তা-ই বোঝাতে চান। তাহের মুসলমান হলেও ব্রাহ্মণ সন্তান। হিন্দু শাস্ত্রের কথা তিনি জানতেন। তাই কোনো বাকবিতণ্ডা না করে কিছুদিন পর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে কামদেব ও জয়দেবকে এক জলসায় নিমন্ত্রণ করেন এবং তাদের বসার স্থানের পাশে গোমাংস রন্ধন শুরু করেন। মজলিশের চতুর্দিকে গোমাংসের সুঘ্রাণ ছড়ালো। অনেক দাওয়াতী হিন্দু নাকে কাপড় গুঁজে পলায়ন করল। কামদেব ও জয়দেব চলে যাচ্ছিল। ঠিক এসময় তাহের বা পীরল্যা খাঁ দুই ভাইকে জোর করে ধরে বললেন, ঘ্রাণে যখন অর্ধেক ভোজন হয়, তখন নিশ্চয়ই গোমাংসের ঘ্রাণে তোমাদের জাত গিয়েছে। তারা পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাহেরের লোকেরা জোর করে তাদের মুখের মধ্যে গোমাংস পুরে দিলো। এভাবে জাত খুইয়ে কামদেব কামাল খাঁ ও জয়দেব জামাল খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হলেন এবং এ কারণেই তাদের গোষ্ঠীর অনেককেই সমাজচ্যুত করা হলো। কিন্তু খান জাহান আলী ও তাহের বা পীরল্যা খাঁর কৃপায় অর্থের জোরে ঐ দুই ভাই জাতে উঠলেন এবং রায় চৌধুরী পদবি পেলেন । কিন্তু স্ব-সমাজে পীরালী বলে অচল রইলেন। হিন্দুদের সাথে তাদের কোনো সংশ্রব রইল না। এই হলো পীরালী ব্রাহ্মণের মূল কাহিনি।

এদিকে কামদেব ও জয়দেবের অপর দুই ভাই রতিদেব ও শুকদেব দক্ষিণডিহিতে থাকেন। সমাজের অত্যাচারে রতিদেব গ্রাম ছাড়লেন। শুকদেবও সমাজের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। বোন-কন্যার বিয়ে দিতে পারছিলেন না। অবশেষে পিঠাভোগের জমিদার তনয় জগন্নাথ কুশারীর সাথে কন্যার বিয়ে দিলেন। কিন্তু বিয়ের পর জামাতা জগন্নাথ কুশারীও সমাজে পতিত হলেন। একসময় দক্ষিণডিহি শ্বশুর বাড়িতে বসবাস শুরু করলেন। জগন্নাথ কুশারীই ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ। জগন্নাথের শ্বশুর শুকদেব ঠাকুর জাতি কলহে বিরক্ত হয়ে কলকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রামে চলে আসেন। জগন্নাথের অধস্তন পুরুষ পঞ্চানন কুশারী ইংরেজ সারেংদের জাহাজে মালপত্র ওঠানো-নামানো ও খাদ্য পানীয় সংগ্রহ কার্যে নিয়োজিত হন। আর তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেন হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণির লোকেরা। এসব লোকেরাই পঞ্চাননকে ঠাকুর মশায় বলে সম্বোধন করতো। এভাবেই ঠাকুর উপাধির উৎপত্তি। পঞ্চানন কুশারী বা ঠাকুরের পরবর্তী বংশধরেরা হলেন পর্যায়ক্রমে– আমিন জয়রাম, নীলমণি, রামলোচন ও দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথ রামলোচনের আপন ভাই রামমণির পুত্র। দ্বারকানাথকে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের এক পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উল্লেখ্য, জয়রাম ঠাকুরের পুত্র নীলমণি ঠাকুরের সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের উদ্ভব।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ঠাকুর পরিবার সেকালে সম্মান ও মর্যাদার সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বারকানাথের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। বিলেতের রানি তাঁকে প্রিন্স উপাধি দিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের খ্যাতি আজও অম্লান। কিন্তু তা সত্ত্বেও সনাতন হিন্দু সমাজের কাছে ঠাকুর পরিবার ছিল পরিত্যক্ত। বিশেষ করে বিয়েশাদীর ব্যাপারে ঠাকুর পরিবার কোনোকালেই স্ব-সমাজের কাছে ঘেঁষতে পারেনি। পীরালী ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ। হিন্দুরা মনে করত ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষেরা গোমাংস ভক্ষণ করে জাতি খুইয়েছে। অবশ্য দ্বারকানাথের সময় থেকেই ঠাকুর পরিবার থেকে পুরোপুরি হিন্দুয়ানী আচার-আচরণ লোপ পেতে শুরু করে। দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকেই ঠাকুর পরিবার রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

ঠাকুর পরিবারের পূর্বসূরিদের স্বজাতি থেকে পীরালী গোত্রে পরিণত হওয়ার এই কাহিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত iex›`ªRxebxi চার খণ্ডের প্রথম খণ্ডের 'বংশ পরিচয়' অধ্যায়ে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। পাঁচশ বছর পূর্বের সেই কাহিনি এখন শুধু ইতিহাস।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

পরম আপন সাহসিকা

শাফিকুর রাহী

কৃষক ভাইয়ের ভাঙা ডেরায় ছনের চালায়;
সুখের ঝিলিক নতুন বধূর রঙিন বালায়।
অন্ধ-অজ পল্লিগাঁয়ে আলোর নাচন
সুখ-আনন্দে মাটির সাথে নিত্য বাঁচন।
সবখানেতে ডিজিটালের আলোর আভায়
মনটা নাচে; নতুন করে বাঁচতে ভাবায়।
ভোট ও ভাতের অধিকারের শপথ পাঠে;
কার ডাকেতে জাগল মানুষ আঁধার মাঠে!
ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারায় চলতে পথে
চড়বে সবাই সখ্য এবং সাম্য রথে।
সকল ক্ষেত্রে সফলতায় সম্ভাবনায়
কে সে মহান; দূরদর্শী পথ যে দেখায়।
পিতার স্বপ্ন বৈষম্যহীন স্বদেশ গড়ার;
দীক্ষা যে দেয় আঁধার ভেঙে যুদ্ধে লড়ার!
তিমিরনাশী কার ডাকেতে বইলো জোয়ার;
কার গরিমায় দুঃশাসনের ভাঙল খোয়াড়!
জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি সাহসিকা–
বীর বাঙালির পরম আপন নির্দেশিকা।
ভয়ার্তকাল স্বজনহারার দুঃখ বুকে
গরিব দুখি নিরন্নদের মলিন মুখে
ভালোবাসার আশার আলোয় ফুটল হাসি
প্রাণের টানে গাইল গীত স্বদেশবাসী।
অধিকারহীন ছিটবাসীদের আঁধার ঘরে;
কার নেতৃত্বে জ্বলল বাতি; কে সে লড়ে!
নীল সাগরের ঊর্মিমালায়, জোয়ার-ভাটায়
সমহিমায় বীর দাপটে পাল যে খাটায়
দেশরত্নের গৌরবোজ্জ্বল অভিযাত্রায়,
স্বদেশ প্রেমে এগিয়ে চলেন ভিন্নমাত্রায়।
বীর দাপটে পিতার স্বপ্ন সাহস বুকে,
এগিয়ে চলেন শত বাধার আঁধার রুখে।
বীরত্বেরই গর্বগাথায় আপন টানে,
আনন্দেরই ঝর্ণাধারা সবার প্রাণে।
অনিয়মের নিয়ম-নীতি দূর হয়ে যাক,
দেশের দুশমন গুপ্তঘাতক যাক পুড়ে যাক।
আলোকিত এক আগামী বিনির্মাণে
সম্প্রীতি সুর বেজে উঠুক সবার প্রাণে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

আতিক আজিজ

পঁচিশ বৈশাখ বারোশ আটষট্টি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি
শুভক্ষণে জন্ম নিলেন রবি সাথে নিয়ে জ্ঞানের গাড়ি।
শিক্ষাজীবনে চঞ্চলমতি কবির বিদ্যালয়ে ছিল না মন
ঘরে বসেই শিক্ষকদের সাথে কাঁটাতো সারাক্ষণ।
সতেরো বছরে গেল বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে
পড়াশোনা শেষ না করেই ফিরল স্বদেশ ভূমিতে।
বাংলাদেশের শিলাইদহে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর
পিতার জমিদারি দেখতে ছিলেন বহুদূর।
কাব্য-উপন্যাস-গল্প-নাট্য লেখায় ছিলেন মহান
বিশ্বকবি তুলনা নিজেই প্রতিভা আলোর দান।
উনিশশ তেরোতে পেলেন সম্মাননা বিশ্বলোকের সভায়
নোবেল প্রাইজ পেলেন তিনি গীতাঞ্জলির আভায়।
বাইশ শ্রাবণ তেরোশ আটচল্লিশে স্বর্গে পাড়ি দিলেন
বাঙালিসহ বিশ্বমানবেরে শোকাতুর করে দিলেন।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে বহমান
স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ইতিহাসে সুমহান।

হে সবুজ

রোকসানা গুলশান

এই লোকসান, এই বেদনা, এই ধাবন
তোমায় দিলাম সবুজ পাতা
গ্রহণ করো আমার অভিবাদন
মেলে ধরো এ হৃদয়,
সময়ের ধুলোসহ করে অনুগ্রহ।
কালবোশেখির হঠাৎ দমকায়
যেও না ভেসে থেকো স্থির
মাল্যবানের মতো।
অন্ধকারে জমে যদি বুকের পরে তোমার
কুয়াশার মতো বেদনা শুষে নিও সব।
বিপন্ন বিস্ময়ে জেগে থেকো রাত
ভোরের ভাবনায়
কোকিলা যে তোমারই পরশ পেয়ে
শোভনা হয়ে যাবে।

বিশ্বকবি

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

গীতাঞ্জলির কবি তুমি বীর পুরুষের কবি
তুমি ছিলে এই ধরাতে মানবতার ছবি।
নারী মুক্তির কবি তুমি ছোটোদেরও কবি
ভালোলাগে তোমার লেখা গান-কবিতা সবই।
সত্য-ন্যায়ের বুলি তুমি অত্যাচারীর জন্য
তাই ধরাতে করল তোমায় বিশ্বকবি গণ্য।

পান্থজনের সখা

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

গল্প-নাটক-কাব্য-ছড়া কিংবা উপন্যাসে
ওই যে দেখ রবীন্দ্রনাথ সবকিছুতেই হাসে।
হাসে আকাশ, এই প্রকৃতি, বাতাস ঝিরিঝিরি
সংকটে আর ক্রান্তিকালে রবির কাছেই ফিরি।
জীবনবোধের গভীর থেকে
সুন্দরতা আনেন ছেঁকে
সেই সুন্দর দেন বিলিয়ে তাঁর সংগীত-সুরে
তাইতো আছেন রবীন্দ্রনাথ সবার হৃদয় জুড়ে।
ভাবনা-জগৎ, জ্ঞান-দর্শন, সকল শুভ কাজে
তাঁর লেখাতে জীবন-কথা মূর্ত হয়ে বাজে।
তিনিই আমার বোধের জগৎ করেন উন্মোচন
হৃদয় থেকে করেন যত গ্লানির ঘুণ মোচন।
পান্থজনের সখা রবি
ধ্যানী পুরুষ, মহান কবি
তাঁর নামে হই অবনত শ্রদ্ধা এবং প্রেমে
সৌন্দর্যের সব মহিমা তাঁর কাছে যায় থেমে।
রবীন্দ্রনাথ মহান ঋষি সকল কবির কবি
বাঙালিদের অন্তরে তাই অঙ্কিত তাঁর ছবি।
তাঁর নিকটে পাই প্রেরণা, জীবন জয়ের বাণী
সুর-লহরির মূর্ছনা তাঁর শ্রেষ্ঠ বলেই জানি।
সাহিত্য আর শিল্পে তিনি
করে গেছেন অপার ঋণী
সেই ঋণভার শোধ করবার সাধ্য কারও নাই
তিনিই দিলেন মানবপ্রেমের নতুন ধারণাই।
মাথার ওপর রবীন্দ্রনাথ জ্বলেন রবির মতো
তিনিই আমার উদ্দীপনা, এগিয়ে চলার ব্রত।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা

ইফফাত আরা দোলা

জাতীয় কবি কাজী নজর"ল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসেবেই সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর নামের সঙ্গে এ বিশেষণটি জুড়ে যায় মাত্র একটি কবিতা লেখার পর– কবিতাটির নাম 'বিদ্রোহী'। একটি কবিতা লিখেই গোটা সমাজে এমন ঝড় তোলার কৃতিত্ব নজর"ল ছাড়া সম্ভবত আর কারোরই নেই। প্রায় দু'শ বছরের অত্যাচারে জর্জরিত নির্জীব জাতিকে শোষণের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে 'বিদ্রোহী'র পঙ্‌ক্তিমালায়। এই কবিতা নজর"লকে স্বাধীনতাকামী মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে দেয়। এ কবিতায় তিনি ঘুণেধরা পরাধীন জীর্ণ সমাজ ভেঙে একটি স্বাধীন শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। 'বল বীর-/বল উন্নত মম শির!/শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!'– বলে তিনি বাঙালির ভেতরের আমিত্বকে জাগিয়ে তুললেন। সমস্ড় অন্যায়ের বির"দ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলেন। 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পরই তিনি 'বিদ্রোহী কবি' রূপে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন।

কবিরা স্বভাবতই সমাজ ও কাল সচেতন পুর"ষ। তাই তাঁদের মানস সমকালের পরিস্থিতিতে উজ্জীবিত হয়, উদ্বেলিত হয়। সমাজের শোষণ-বঞ্চনা-হাহাকার তাদের সংবেদনশীল মনকে পীড়িত ও তাড়িত করে। নজর"ল ছিলেন পরাধীন দেশের যুগ সচেতন কবি। সদ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফেরত তর"ণ হাবিলদার কবি নজর"লও তাড়িত হয়েছিলেন তৎকালীন পরাধীন ভারতে চলতে থাকা অত্যাচার-নিপীড়নে। বিদেশি শাসনে মৃতপ্রায় বাঙালিকে শিরদাঁড়া সোজা করে প্রতিবাদে মুখর হবার ডাক দেন তিনি। বিদ্রোহে ঝংকৃত শব্দরাজি স্বাধীনতাকামী বাঙালির রক্তে দিয়েছে দোলা, উদ্বুদ্ধ করেছে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে র"খে দাঁড়াতে। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাঙালির সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছেন। দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসায় সিক্ত করে তুলেছেন হৃদয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের উপনিবেশ ভারতে নজর"লের কবি সত্তার উন্মেষ ও বিকাশ। তাই সমাজ সচেতন যুদ্ধ ফেরত কবি হিসেবে নজর"লের কবিতায় দ্রোহের উপস্থিতি থাকবে– এটাই যেন ছিল স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। যেমনটা আমরা দেখতে পাই টি.এস. এলিয়টের w` I‡q÷ j¨vÛ কাব্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপের বিধ্বস্ড় রূপ। কবিতায় নজর"লের এই বিদ্রোহী মনোভাব তৈরি করেছে তাঁর সময়। আর নজর"ল ছিলেন সময়ের সাহসী সন্ড়ান। যে সময়ে তাঁর কবিত্বের উন্মেষ, যে সময়ে তিনি কাব্যচর্চা করেছেন, সে সময়ের দিকে ফিরে তাকালেই এ কথার যথার্থ বোঝা যায়।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোম্পানির কাছে পরাজিত হলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত ঘটে। ১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে স্থানান্ড়রিত হয়। রানি ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে ভারতের শাসনভার তুলে নিলে ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশরা ব্যবসা করার কথা বলে বাংলায় এলেও তাদের মূল লক্ষ্যই ছিল শোষণ করা। যে চুক্তির বলে তারা ব্যবসা করার অনুমতি পায়, কিছুদিনের মধ্যেই তারা তা খেলাপ করে স্থানীয়দের ঠকাতে শুর" করে। শুর" হয় তাদের অবাধ শোষণ, লুটপাট, নির্যাতন ও নির্বিচারে হত্যা। এদেশের মানুষের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে আদায় করা খাজনা তারা নিজেদের দেশে পাচার করতে থাকে। ভারতবাসী কিন্তু এসব জুলুম নীরবে মেনে নেয়নি। ব্রিটিশদের দেশছাড়া করে ভারতবর্ষ স্বাধীন করার শপথ নেন বিপ্লবীরা। ব্রিটিশদের দুঃশাসনের বির"দ্ধে প্রতিবাদের স্বাক্ষর পাওয়া যায় তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়, মীরাটের বন্দিশালায়, বাহাদুর শাহ পার্কে, অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে। স্বাধিকার আদায়ে বন্দুকের গুলি খেয়ে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে অনেক তর"ণ, ক্ষুদিরাম নির্ভয়ে উঠেছে ফাঁসির মঞ্চে। খাদ্যশস্যের পরিবর্তে নীল চাষের জন্য সাধারণ কৃষকদের ওপর ইংরেজ শাসকদের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের চিত্র দেখা যায় দীনবন্ধু মিত্র রচিত bxj `c©Y নাটকে। প্রায় দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে মানুষ বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করেছে ইংরেজদের বির"দ্ধে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮৫৭ সালে ভারতে স্বাধীনতার প্রথম আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইংরেজরা যাকে সিপাহি বিদ্রোহ বলে অভিহিত করে। ইংরেজরা এই বিদ্রোহ এদেশীয় কিছু দালালদের সাহায্যে কঠোরভাবে দমন করলেও এর মাধ্যমে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়। এরপর তারা সৈন্যদের সাথে সাথে সাধারণ মানুষদেরও নির্বিচারে হত্যা করে, গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়, ভীতি সৃষ্টি করতে রাস্ড়ার পাশে তাদের লাশ ঝুলিয়ে রাখে।

নজর"ল যখন 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লেখেন সে সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল উত্তাল। ব্রিটিশ সরকারের চরম নিপীড়নের জবাবে গান্ধীজির নেতৃত্বে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। এই আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে ভারতবাসীকে একাত্ম করে তোলে। এই টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নজর"ল লেখেন তাঁর কালজয়ী কবিতা 'বিদ্রোহী'। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে কোনো এক রাতে ৩/৪ সি, তালতলা লেনের বাড়ির নিচের তলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে বসে তিনি 'বিদ্রোহী' রচনা করেন। এ কবিতাটি অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত weRjx পত্রিকায় ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি (১২ই পৌষ, ১৩২৮) প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু কবিতাটির গগনচুম্বী জনপ্রিয়তার কারণে বাজারে থাকা পত্রিকার সমস্ড় কপি নিমেষে বিক্রি হয়ে যায়। আগ্রহী পাঠকের চাহিদা মেটাতে weRjx ছাড়াও cÖevmx (মাঘ ১৩২৮), mvabv (বৈশাখ, ১৩২৯), a~g‡KZ (২২শে আগস্ট ১৯২২) প্রভৃতি পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। 'বিদ্রোহী'

১৯২২ সালে নজর“লের সর্বাধিক প্রচারিত কাব্যগ্রন্থ AwMœexYvতে সংকলিত হয়।

পরাধীনতার অব্যক্ত বেদনার হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'বিদ্রোহী'র পুরো অবয়বে। তিনিই তাঁর কবিতায় শিখিয়েছেন জীবনের চাইতেও দেশের মুক্তি অনেক বড়ো। ১৪টি ছোটো-বড়ো স্তবকে ও ১৪১টি পঙ্‌ক্তিতে রচিত কবিতাটিতে নজর“ল 'আমি' সর্বনাম ব্যবহার করেছেন মোট ১৪৫ বার। এই 'আমি' পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষের প্রতিনিধি। কারো অধীন হয়ে নয়, বরং স্বাধীনভাবে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার মাঝেই রয়েছে মানবজীবনের সার্থকতা। তাই তিনি 'বিদ্রোহী'তে বলেছেন, 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'।

ভাব-ভাষা-উপমা-ছন্দে 'বিদ্রোহী' এক অনবদ্য কবিতা। এতে গতানুগতিক ছন্দের ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এ ছন্দ নজর“লের নিজের সৃষ্টি। ছন্দের এই প্রয়োগ সম্পর্কে ড. রফিকুল ইসলাম বলেছেন, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি মাত্রাবৃত্তমুক্তক ছন্দে রচিত, এ কবিতায় মাত্রা বৃত্তমুক্তক ছন্দ শামিল; কিন্তু ছন্দের বৈশিষ্ট্য আনা হয়েছে মাত্রাবৃত্ত প্রবহমানতা সঞ্চার করে। পর্ব বিভাগ ছয় মাত্রার চালে; কিন্তু চরণের শুর“তে একটি অতিরিক্ত পর্ব এবং চরণের শেষে খ” পর্ব রয়েছে, ফলে পঙ্‌ক্তিগুলো সমান নয়। এই বৈচিত্র্য প্রয়োজন হয়েছে ভাব ও বক্তব্যের কারণে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের যে বিচিত্র প্রকাশ তাতে ঐ ছন্দ বৈচিত্র্যের প্রয়োজন ছিল'।

'বিদ্রোহী' দেশব্যাপী কেমন সাড়া ফেলেছিল সে প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু তাঁর আত্মজীবনী Kv‡ji cyZzj-এ লিখেছেন–

'ঠিক এই উন্মাদনারই সুর নিয়ে (অসহযোগ আন্দোলনের সুর) এই সময়ে নজর“ল ইসলামের কবিতা প্রথম আমার কাছে পৌঁছল। 'বিদ্রোহী' পড়লুম। ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে মনে হলো, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করেছিল, এ যেন তাই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী'।

কল্লোল গোষ্ঠীর বিখ্যাত লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য–

'কাব্য-বিচারে 'বিদ্রোহী'র মূল্য সকলের কাছে সমান না হতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন যুগ-মানস যে প্রথম এ কবিতার মধ্যেই প্রতিবিম্বিত এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করবেন না। এ কবিতার বিশৃঙ্খল ছন্দ ও উগ্র উৎকট উপমা উৎক্ষেপণও যেন সে যুগের অন্তরলোকের নির“দ্ধ বাষ্পাবেগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত'।

gvwmK emygZx পত্রিকা কার্তিক ১৩৬২ সংখ্যায় অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন–

'পরের দিন সকালে এসে কবি (নজর“ল) চারখানা 'বিজলী' নিয়ে গেলো, বললে, গুর“জীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। কাজী তাঁর সামনে অঙ্গভঙ্গি সহকারে বিজলী হাতে নিয়ে উচ্চৈস্বরে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তাঁকে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) শুনিয়ে দিল। তিনি স্তব্ধ-বিস্ময়ে কাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে কাজীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, বললেন, আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিদ্রোহী'কে অসাধারণ কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তাঁর পত্রিকার সম্পাদকীয়তে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানান।

স্বয়ং কবিগুর“র এমন প্রশংসা পেলেও 'বিদ্রোহী'র সমালোচনাও কিছু কম হয়নি। মোহিতলাল মজুমদারসহ তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম লেখকদের অনেকেই কবিতাটির বিরোধিতা করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, এমনকি নজর“লকে হেয় করতে কটু কথা বলতেও পিছপা হননি। নজর“লকে আঘাত করার জন্য ব্যাঙ্গাত্মক কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল সে সময়। সজনীকান্ত দাস kwbev‡ii wPwV'র ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৪ সংখ্যায় 'ব্যাঙ' শিরোনামে ও গোলাম মোস্তফা mIMvZ পত্রিকার মাঘ, ১৩২৮ সংখ্যায় 'নিয়ন্ত্রিত' নামে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লেখেন।

নজর“ল তার“ণ্যদীপ্ত যৌবনের জয়গান গেয়েছেন 'বিদ্রোহী' কবিতায়। তাই কোনো সমালোচনাই টিকতে পারেনি 'বিদ্রোহীর' প্রবল জনপ্রিয়তার সামনে। তাঁর এ কবিতা স্বাধীনতার সৈনিকদের জুগিয়েছে অপরিসীম মনোবল। এটি সাধারণ কবিতার আবেদন ছাপিয়ে হয়ে উঠেছিল অনবদ্য। হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিবাদের হাতিয়ার; হয়ে উঠেছিল অস্ত্রের চেয়েও বেশি শক্তিমান। এ কারণেই স্বদেশীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো 'বিদ্রোহী'র একেকটি পঙ্‌ক্তি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য স্মর্তব্য–

'কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না, এসব তোমাদের আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝন্‌ঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐক্যতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈকি! আমি যদি আজ তর“ণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ওই সুর বাজত'।

'বিদ্রোহী' কবিতায় নজর“ল জাগিয়ে তোলেন দীর্ঘকাল পরাধীনতার জিঞ্জিরে বন্দি শ্রান্ত-ক্লান্ত-নির্জীব বাঙালি জাতিকে। আধামরা বাঙালিকে কবিতার ঘা মেরে তিনি বাঁচিয়ে তুলতে চাইলেন। হিন্দু-মুসলমানকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার ডাক দিলেন এই কবিতায়। ঔপনিবেশিক শাসনে সাম্প্রদায়িকতার গরল পান করে বাঙালিরা যখন বিভক্ত, তখন হিন্দু-মুসলিম, মিথ-পুরাণের প্রসঙ্গ এনে নজর“ল তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধলেন। তিনি লিখলেন–

১. আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা বারিধির।
২. আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
৩. আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক যমদগ্নি,
৪. আমি বজ্র, আমি ঈষাণ-বিষাণে ওংকার,
আমি ঈসরাফিলের শিঙ্গার মহা-হুংকার,
৫. আমি চক্র-মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচ”!
৬. তাজি বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে!

এমন চমৎকারভাবে হিন্দু-মুসলিম-মিথের সহাবস্থান বাংলা কবিতায় আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না। নজর“ল নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আর 'বিদ্রোহী'ও এ কারণে পেয়েছে অনন্যতা।

নয় শুধু প্রেম, নয় শুধু দ্রোহ– সমস্ত শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়নের অবসান ঘটিয়ে মানুষের স্বাধীনতার জয়গান গেয়েছেন কবি নজর“ল। সাহিত্যের মাধ্যমে নজর“ল চিরকালই সত্য-সুন্দরের সাধনা করে গেছেন। মানবমুক্তির, আত্মোন্নয়নের পথের দিশা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সমসাময়িক জনপ্রিয় কবিদের মতো কেবলই রোমান্টিকতায় না ভুগে তিনি লেখনীকে অস্ত্র করে কবিতায় তোলেন বজ্রনিনাদ। নজর“লের মতো আর কেউ এমন করে স্বাধীনতাকামী বাঙালিকে 'বীর' সম্ভাষণ করে আত্মোপলব্ধি করাতে পারেননি। তাই এ কবিতায় প্রত্যেকেই অনুভব করেছেন তার সত্তাকে, নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে এবং সেই সাথে একাত্ম হয়েছেন কবির 'আমিত্বে'র সাথে। যুগের প্রয়োজনে 'বিদ্রোহী' রচিত হলেও শিল্পগুণে তা অর্জন করেছে চিরন্তন সাহিত্যের মর্যাদা। তাই প্রায় এক শতাব্দী অতিবাহিত হবার পরেও 'বিদ্রোহী' তার জন্মলগ্নের মতোই আজও প্রাসঙ্গিক।

লেখক: এমফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃণালিনী

আখতার হামিদ খান

মানুষ সামাজিক জীব– এটা বহু পুরনো কথা। তবে সমাজের বন্ধন সে কখনো কখনো কাটিয়ে উঠতে পারে। দেখতে গেলে সমাজের বন্ধনের চেয়ে পরিবারের বন্ধন গভীর ও গাঢ়। পরিবারের ভিত্তি একজন নারী ও একজন পুরুষের স্বেচ্ছাকৃত বিবাহবন্ধন। পরিবারের মধ্যে মাতা ও পিতার স্নেহচ্ছায়ায় সন্তানসন্ততির আশ্রয়। মাতা ও পিতার জীবনের সার্থকতা অনেকটা নির্ভর করে তাদের ভক্তি, ভালোবাসা ও আনুগত্যের ওপর। পরিবারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চরিত্র পৃথক ধরনের। এ সম্পর্কের মধ্যে যেমন আছে মাধুর্য তেমনি আছে তিক্ততা, যেমন আছে স্নিগ্ধতা তেমনি আছে রুঢ়তা। এ সম্পর্ক কখনো বিস্ময়ের রঙে রঞ্জিত, আবার কখনো বাস্তবতার আঘাতে জ্বালাময়, শ্রীহীন। দাম্পত্য সম্পর্ককে এক কবি বলেছেন, 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন।'

নর-নারীর এ সম্পর্কে যখন সংকট-সংঘাত সৃষ্টি হয়, তখন তাদের সংবেদনশীল চিত্ত বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, সমগ্র সত্তায় জাগে আর্তনাদ, হাহাকার। দাম্পত্য জীবনের মধ্যে সংকটের সংঘাত যখন বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তখন তাদের কণ্ঠে বেদনার সুর বেজে ওঠে।

দাম্পত্য জীবনে নারী তার পুরুষ সাথিকে যেমন একান্ত করে চায়, পুরুষও তার নারী সাথিকে একান্ত করে চায় আজীবন।

নারী ও পুরুষের স্ব স্ব সৃষ্ট সংকট যে বিচ্ছেদ আনে তার সমাধান কখনো কখনো হয়ত তারা করতে পারে। কিন্তু এক বিচ্ছেদের প্রতিকার তাদের ক্ষমতার বাইরে। সেটা হলো মৃত্যু।

দাম্পত্য জীবনে প্রেম ও ভালোবাসার বন্ধন যত গভীর-গাঢ়-অবিচ্ছেদ্য মনে হোক না কেন নারী ও পুরুষের মধ্যে মৃত্যু বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেই। অবশ্য সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে নারী ও পুরুষ সেই শূন্যস্থান কখনো কখনো আর একজন পুরুষ বা নারী দিয়ে পূর্ণ করে। তবু অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীর মৃত্যু স্বামীকে বিকল, বিহ্বল করে, স্বামীর মৃত্যু স্ত্রীকে করে নিঃস্ব, অসহায়।

এই ক্ষতের দহন থেকে বেজে ওঠে গানের সুর, কবিতার ছন্দ, নাটকের সংলাপ। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' অক্ষয় কুমার বড়ালের 'এষা'– এমনি এক দহন জ্বালার সৃষ্টি।

সভ্য মানুষ জীবনযাপন করে বিবাহবন্ধনের মধ্যে। জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও এ সম্পর্ক নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া, স্নেহ-সহানুভূতি সৃষ্টি করে। অবশ্য অবস্থা বিশেষে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা, জিঘাংসাও সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনে সঙ্গিনীর বিষয় প্রায় উহ্য রয়েছে রবীন্দ্র কাব্য সমালোচনায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাস দু'য়েকের মধ্যে রচনা করেন 'স্মরণ' কাব্য। এই কাব্যে স্ত্রী-বিয়োগের বেদনা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যের আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে এবং তাঁর দাম্পত্য জীবনের বিষয় সংক্ষেপে বলা দরকার।

তিনি অবশ্য বলেছেন, 'আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই।' অর্থাৎ তাঁর বিয়েটা হয়েছিল সাদামাটাভাবে– এটাই তিনি বলতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন হতে পারে রবীন্দ্রনাথের পাত্রীর জন্য যশোর যেতে হলো কেন? রবীন্দ্রনাথেরা পীরালী ব্রাহ্মণ বলে সে যুগে হিন্দুরা তাদের ঘরে পুত্র-কন্যার বিয়ে দিতে চাইতেন না। তাই তাদের পুত্র-কন্যার বিয়ের পাত্রী-পাত্র তাঁদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান যশোর থেকে আনতে হতো।

রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল ২২ বছর বয়সে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় পাত্রীর বয়স ছিল ১১ বছর। এতে তাঁর আপত্তি-অসম্মতি দেখা যায়নি। বরং জানা যায়, অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বৌদি কাদম্বরী ও জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যশোরে তাঁর পাত্রী খুঁজতে গিয়েছিলেন। যশোরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত তাঁদের মনমতো পাত্রী পাওয়া গেল তাঁদের জমিদারির কর্মচারী বেণী মাধব রায়ের বাড়িতে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর তাঁদের একজন কর্মচারী।

প্রসঙ্গত বলা যায়, সে যুগে বাল্যবিবাহ ছিল সর্বসম্মত প্রথা। রবীন্দ্রনাথ সে প্রথা মেনে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কবি মধুসূদন দত্ত। বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর। রবীন্দ্রনাথ তখন উদীয়মান কবি। বিয়ের পূর্বে 'বনফুল', 'ভগ্ন হৃদয়', 'সন্ধ্যা সংগীত', 'প্রভাত সংগীত' এবং উল্লেখযোগ্য উপন্যাস †eŠ VvKzivbxi nvU প্রকাশিত হয়েছিল।

যশোরের মেয়ের নাম ছিল ভবতারিণী। একেবারেই সেকেলে। তাই রবীন্দ্রনাথের পছন্দমতো তাঁর নামকরণ হলো 'মৃণালিনী'। তাঁকে আধুনিক করে তোলার জন্য লরেটো হাউসে পড়তে পাঠানো হয়েছিল। বাড়িতে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছিল বলে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটক ivRv I ivYxÕতে মৃণালিনী 'নারায়ণী'র ভূমিকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। তবে ঠাকুর বাড়ির সাহিত্য-সংস্কৃতির আয়োজনে তাঁর ভূমিকা নেপথ্যেই থেকে গেছে।

তিনি সুগৃহিণী ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। রান্নাবান্না, ঘরসংসার

পরিবারের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোছানো ইত্যাদি কাজে পটীয়সী ছিলেন। জমিদার বাড়ির বড়ো কবির স্ত্রী হিসেবে তাঁর কোনো অহংকার ছিল না। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সাধারণ। পুত্র রথীন্দ্রের লেখা থেকে–

'শেষ পর্যন্ত হাতে কয়েক গাছা চুড়ি ও গলায় একটি চেন হার ছাড়া কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না।' তাঁর কাজকর্মের প্রয়াস লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে তাঁকে লিখেছিলেন, 'আমাকে সুখী করবার জন্যে তুমি বেশি কোনো চেষ্টা করো না– আন্তরিক ভালোবাসাই যথেষ্ট। অবশ্য তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকল ভাবেই যদি যোগ থাকতো খুব ভালো হতো– কিন্তু সে কারও ইচ্ছায়ও নয়। যদি তুমি আমার সঙ্গে সকল রকম বিষয়ে সকল রকম শিক্ষায় যোগ দিতে পারো তো খুশি হই– আমি যা শিখতে চাই তুমিও আমার সঙ্গে শিক্ষা কর তাহলে খুব সুখের হয়। জীবনে দু'জনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়– তোমাকে কোনো বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করিনে– কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে– আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুঁৎ খুঁৎ না করে ভালোবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর– আমাকে অনাবশ্যক দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে।'

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় সংস্থাপন ব্যাপারে মৃণালিনীর সহায়তার কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। মৃণালিনী দেবীর রসবোধ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অনেক চিঠিপত্রে। সুখীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠি থেকে তাঁর সেই রসবোধের প্রমাণ পাওয়া যায়।

'...তোমার সুন্দর মেয়ে হয়েছে বলে বুঝি আমাকে ভয়ে খবর দাওনি পাছে আমি হিংসা করি, তার মাথায় খুব চুল হয়েছে শুনে পর্যন্ত 'কুন্তলীন' মাখতে আরম্ভ করেছি, তোমার মেয়ে মাথাভরা চুল নিয়ে আমার ন্যাড়া মাথা দেখে হাসবে, সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। সত্যিই বাপু, আমার বড় অভিমান হয়েছে, না হয় আমাদের একটি সুন্দর নাতনী হয়েছে, তাই বলে কি আর আমাদের একেবারে ভুলে যেতে হয়।'

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

মো. আব্দুল লতিফ বকসী

মহাকাশে বাংলাদেশ, শুনতে ভালোই লাগছে। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠালো মহাকাশে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নামে এ উপগ্রহটি এখন মহাকাশে। উপগ্রহটি উৎক্ষেপণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় প্রেরণ করা হয়। দি আমেরিকান ফার্ম স্পেস-এক্স-এর মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করা হয় এটি। ৩০শে মার্চ এ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে উৎক্ষেপণকারী কর্তৃপক্ষ। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের এটি একটি বিশাল অর্জন।

বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন

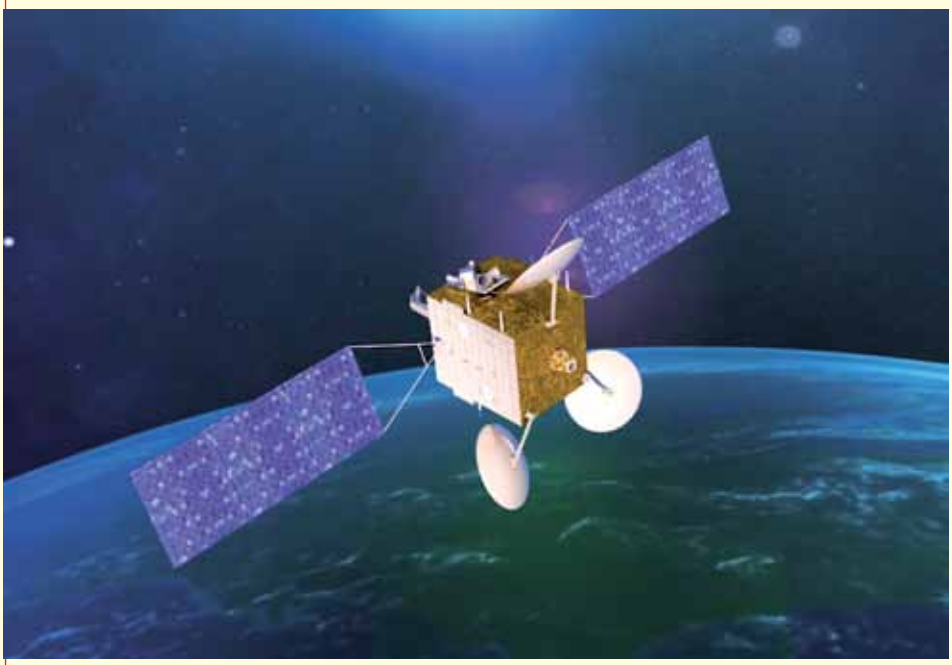

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন-এর মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র (স্পারসো) এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। এতে খরচ হয় ৩ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা। এতে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের ১ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। বাকি ১ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ থেকে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক্সিম ব্যাংক, ফ্রান্সের এইচএসবিসি, জাপান ব্যাংক অফ ইন্টারন্যাশনাল, সিডব্লিউজি গালফ ইন্টারন্যাশনাল অফ ইউকে, চায়না গ্রেট ওয়াল ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশন এ প্রকল্পে ঋণের মাধ্যমে অর্থ যোগান দিচ্ছে। মহাকাশে অত্যাধুনিক যোগাযোগ সুবিধা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এ কৃত্রিম উপগ্রহটি পাঠানো হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ বিদেশের স্যাটেলাইট ভাড়া নিয়ে নিজের দেশের প্রয়োজনীয় কাজ পরিচালনা করছে।

দি থালিস আলেনিয়া স্পেস অফ ফ্রান্স, বাংলাদেশের স্যাটেলাইটটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে। আগামী ১৫ বছর এ কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশে কার্যকর থাকবে। তবে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে এটি আরো ৩ বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে। ১ হাজার ৬০০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এ স্যাটেলাইটটির ওজন হচ্ছে ৩.৫ মেট্রিক টন। এ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটটি কক্ষপথে স্থাপন হতে সময় লাগে ৮ দিন। বাংলাদেশ ১১৯.১০ নম্বর সংকেত থেকে স্যাটেলাইটটিকে অত্যাধুনিক টেলিকমিউনিকেশনের কাজে ব্যবহার করা হবে। এরফলে পূর্ব পেলোড কমপ্রাইজিং (payload comprising) ১৪ সি-ব্যান্ড এবং ২৬ কু-ব্যান্ড ট্রান্সপনডার্স থেকে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন সুবিধা পাবে। ১ ট্রান্সপনডার সমান ৩৬ MHz. ফ্যালকন রকেট ৯-এর মাধ্যমে গত ১৬ই ডিসেম্বর স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণের জন্য দি আমেরিকান ফার্ম স্পেস-এক্স প্রাইভেট কোম্পানি সময় নির্ধারণ করেছিল। আমেরিকায় হারিকেন ইমার ক্ষয়ক্ষতির কারণে সে নির্ধারিত সময় বাতিল করতে হয়।

দি থালিস আলেনিয়া স্পেস অফ ফ্রান্স ২৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে স্যাটেলাইটটি নির্মাণের জন্য ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

স্যাটেলাইটটি নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশের রাঙামাটির বেতবুনিয়া এবং গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে দুটি স্টেশনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ দুটি স্টেশন থেকে স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। স্যাটেলাইটের সুবিধা বাজারজাতের জন্য ইতোমধ্যে ২০টি ট্রান্সপনডার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যাপাসিটি দেশের বাইরে বিক্রি করা হবে। কু-ব্যান্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং এ অঞ্চলের ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন এ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটটির সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পাবে। অপরদিকে সি-ব্যান্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কিরগিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং কাজাকাস্তানের কিছু অংশে এ স্যাটেলাইটের সুবিধা সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

বঙ্গবন্ধু-১ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ভিডিও সার্ভিস ফর ডাইরেক্ট টু হোম, ই-লেমিং, টেলি-মেডিসিন, ফ্যামিলি প্লানিং, ফারমিং-এ সেলুলার ব্যাকহোল এবং দুর্যোগ উত্তরণ, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডাটা সার্ভিস এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে এবং অত্যাধুনিক সুবিধা ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ স্যাটেলাইটের অন্যতম সেবা গ্রহণকারীরা হলেন– মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিগুলো, ব্রডব্যান্ড এবং ওয়্যারলেস প্রভাইডারগণ, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডারগণ, কল সেন্টার, যানবাহন ট্র্যাকিং সিস্টেম, তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন কাজে, পিএসটিএন, আইপিটিএসপি, গেটওয়ে, এনটিটিএনসহ অনেক কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। সেবাপ্রাপ্তি সহজ হবে এবং সেবার মান অত্যাধুনিক হবে।

ফলে চাহিদা পূরণের পর এ স্যাটেলাইটের সুবিধা যথাযথ মূল্যের বিনিময়ে বাংলাদেশ উল্লিখিত দেশগুলোতে বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারবে। যে সকল দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট সুবিধা নেই, তারা এ সুবিধা গ্রহণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ মোকাবিলায় নগর স্বেচ্ছাসেবক

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩০ ভাগ মানুষ নগরে বসবাস করে। দ্রুতই এটি ৫০ ভাগে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনায় রয়েছে। সরকারি কিছু স্থাপনা ব্যতীত আমাদের নগর পত্তনের ইতিহাস হলো বালু-ইট-সিমেন্টে নিজেদের ডিজাইনে নিজেদের মতো করে তৈরি করা। এসব বিল্ডিংয়ের বয়সও কম হয়নি। ফলে অধিকাংশ বিল্ডিং কাঙ্ক্ষিত মানে তৈরি না হওয়ায় পুরো নগরকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। প্রায়শই বিল্ডিং ধস হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সচরাচর ঘটছে। রানা প্লাজা ধসের কথা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে। ১১৩৭ জন নিহত ও ২০০ জন নিখোঁজ হয়েছিল সে মর্মান্তিক ঘটনায়। তেমনি বিভিন্ন কলকারখানায় অগ্নিকাণ্ডের খবর প্রায়ই পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে দারুণভাবে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ প্রতিবেশীর যে-কোনো দুর্যোগ ও বিপদে এমনিতেই এগিয়ে আসে। তারপরও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের বিদ্যমানতার কথা অনেকেই বলছেন।

দুর্যোগপ্রবণ প্রত্যেক দেশেই এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বা দল রয়েছে। জাপানের এলাকাভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক টিমের নাম 'ডকুমো' যা বিশ্বে একটি অতি পরিচিত নাম। নিজ নিজ এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় করণীয় সকল কাজই তারা করে থাকেন। যেমন– ভূমিকম্প বা সুনামি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, হ্যাজার্ড ম্যাপ তৈরিকরণ, বিপদাপন্নতা নিরূপণ, স্থানীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান, স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় অধিবাসীদের করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, উদ্ধার সরঞ্জাম, জরুরি খাদ্য ও ঔষধ সংগ্রহ ইত্যাদি। ভিয়েতনাম দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থানীয়ভাবে সোশাল ফান্ড তৈরি করছে যেখান থেকে সব ধরনের খরচ মেটানো হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২-তে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের কথা বলা হয়েছে, 'দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার জনগোষ্ঠীভিত্তিক একটি কর্মসূচি প্রণয়ন ও উহার অধীন জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন করিতে পারিবে'। তার আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নগর স্বেচ্ছাসেবক গঠনের জন্য কাজ করছে।

১৯৭০ সালের উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন উপকূলীয় এলাকার মানুষের জানমাল রক্ষায় 'সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম' বা সিপিপি চালু করেন। এর আওতায় উপকূলীয় জেলাসমূহে ৫৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক যুগান্তকারী অবদান রেখে বাংলাদেশকে বিশ্বে দুর্যোগ মোকাবিলায় রোল মডেল হিসেবে খ্যাতি এনে দিয়েছে।

শহুরে দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ইতোমধ্যে ৩২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের সমন্বয়ে দুর্যোগকালে কাজ করছে।

নগর স্বেচ্ছাসেবকদের আইনি কাঠামো, দায়িত্ব, পরিচিতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজের সভাপতি প্রফেসর নজরুল ইসলামের মতে, নগর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় করতে হবে যাতে স্বেচ্ছাসেবকরা সাবলীলভাবে কাজ করতে পারে। নিজ নিজ এলাকার যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবিলার স্বার্থে কমিউনিটি মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবার মানসিকতা তৈরি করা দরকার।

সেভ দ্য চিলড্রেনের সৈয়দ মতিউল ইসলামের মতে, নগর অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য একটি সাধারণ কর্মপরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন যেখানে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ থাকবে। স্বেচ্ছাসেবকদের ডাটাবেজ ও স্বীকৃতি থাকা প্রয়োজন।

নারায়ণগঞ্জের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করা মো. শহীদ আলামিনের সাথে কথা হয়। তার মতে, এলাকাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করে তাদের নিয়মিত প্রত্যেকটি দুর্যোগের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

সিপিপির পরিচালক আহমাদুল হক কাজ করেন ৫৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে। তার মতে, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা গেলে সারাদেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি সমন্বয়, প্রশিক্ষণ ও জরুরি বার্তা আদান-প্রদান সম্ভব হবে। তিনি বলেন, আমরা ৫৫ হাজার উপকূলীয় স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে কাজ করছি ১০৬ জন কর্মকর্তা। তাই নগর স্বেচ্ছাসেবকের বেলায়ও মাথাভারী প্রশাসন তৈরি না করে স্বেচ্ছাসেবকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, এমন আদলে সংগঠন তৈরি করা প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারাবিলিটি-র প্রফেসর গওহার নঈম ওয়ারা নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কোথাও কোথাও নগরের কর্ণধারেরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নিজেদের নিকটজনদের বেশি করে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী তারিক বিন ইউসুফের মতে, যে-কোনো বিষয়ে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন লোকদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিলে কার্যকারিতা বেশি পাওয়া যাবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের ওয়ার্ডভিত্তিক সংগঠিত করা প্রয়োজন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. রিয়াজ আহম্মদ স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মানী প্রসঙ্গে বলেন, স্বেচ্ছাসেবার মানসিকতা নিয়ে, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে স্বেচ্ছাসেবক হতে হবে। এখানে সম্মানী দেওয়ার সুযোগ নেই। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবার যে মহান ব্রত নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা ঝুঁকি নিয়ে মানুষদের জানমাল রক্ষা করবেন, সেখানে সামান্য সম্মানী দিয়ে তার মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না।

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স-এর মহাপরিচালক আলী আহম্মেদ খানের মতে, স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মানী না দিয়ে যে-কোনো আদলেই হোক কাজের স্বীকৃতি ও রাষ্ট্র থেকে মর্যাদা দেওয়ার চিন্তা থাকতে হবে। এদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ফায়ার স্টেশনগুলোকে ব্যবহার করা দরকার।

নগরের উপর্যুপরী দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে যে-কোনো কাঠামো নিয়েই হোক দ্রুত একটি শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন। জাপানের অভিজ্ঞতায় বলা যায়, যে-কোনো কমিউনিটিতে কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবকরা যাকে পছন্দ করেন তার নেতৃত্বেই ওই কমিউনিটির সংগঠনটি তৈরি করা যেতে পারে। তিনি হতে পারেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অথবা শিক্ষক, ব্যবসায়ী বা প্রকৌশলী। তাদের প্রতিটি দুর্যোগের নিয়মিত প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন। একটি শক্তিশালী ডাটাবেজও থাকতে হবে। নগরের প্রত্যেকটি এলাকার ইভাকুয়েশন সেন্টার নির্ধারিত থাকতে হবে। দুর্যোগের উদ্ধারকারী মালামালগুলোও এলাকাভিত্তিক থাকতে হবে। প্রত্যেকটি এলাকাতেই অগ্নি নির্বাপণের প্রয়োজনীয় জলাধার থাকা চাই। প্রত্যেক লোকালয়ের বিদ্যুৎ ও গ্যাসের লাইন তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা যায় এমন একটি সহজ পদ্ধতি বের করতে হবে যাতে যে-কোনো এলাকাতে অগ্নিকাণ্ড বা বিদ্যুৎ ও গ্যাসের লাইনজনিত কোনো দুর্যোগ ঘটলে সাথে সাথেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি লাইনটি বন্ধ করে দিতে পারেন।

নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা প্রচুর লেখাপড়া করছে, দেশ-বিদেশের খবর রাখছে। মিডিয়াগুলো মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে সংগঠিত দুর্যোগ তাদের সামনে তুলে ধরছে। এর ফলে তারা সচেতন হচ্ছে, নিজেকে নিয়েও ভাবছে। আশা করা যায়, নতুন প্রজন্মের হাত ধরে আমরা দ্রুতই একটি দুর্যোগ সচেতন জাতি হিসেবে নিজেদের গড়তে পারব।

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

রবীন্দ্রনাথের ঘরসংসার

আনসার আনন্দ

আজ থেকে একশ সাতান্ন বছর আগে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে বাংলা ১২৬৮ সনের ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার ভোররাত তিনটায় কলকাতার ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের আদি নিবাস ছিল খুলনার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে। এই গ্রামে আছে রবীন্দ্রস্মৃতি সংগ্রহশালা।

m¨¿xK iex›`ªbv_ VvKzi

ঠাকুর পরিবারের অনেক গুণী ব্যক্তিরা আমাদের কাছে আজও অপরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি এমনকি তাঁর ভাইবোন, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে কেউই আমাদের কাছে তেমনভাবে পরিচিত নন। রবীন্দ্রনাথের প্রপিতামহ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ছিলেন লবণ উৎপাদনকারী এজেন্ট। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী, কয়লাখনির মালিক এবং তাঁর ছিল বহুসংখ্যক ব্যবসা-শিল্পপ্রতিষ্ঠান। রবিঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পৈত্রিক জমিদারি আর ব্যবসা এই নিয়ে কাটত তাঁর ব্যস্ত জীবন। আর মাতা সারদা দেবী ছিলেন অসুস্থ। তখন কবির বয়স মাত্র ১৩ বছর ১০ মাস। ১৮৭৫ সালের ৮ই মার্চ কবিমাতা সারদা দেবী চলে যান পরপারে। এর ঠিক ৩০ বছর পর ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মারা যান।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ১৫ সন্তানের মধ্যে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬ খ্রি.) ¯^cœ cÖqvY কাব্য রচনা করেন। এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারতীয় প্রথম আইসিএস-১৮৬৪ খ্রি.) আহমেদাবাদের জেলা জজ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫ খ্রি.) স্বনামধন্য নাট্যকার, বিখ্যাত মহিলা কবি স্বর্ণকুমারী দেবী Øxc wbg©vY কাব্যগ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পরিবারের ১৫ ভাই-বোনের মধ্যে ১৪তম। দেবেন্দ্রনাথের অন্যান্য সন্তানেরা ছিলেন অসুস্থ, বিকৃত মস্তিষ্ক ও স্বল্প আয়ুর অধিকারী। দেবেন্দ্রনাথ খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণডিহির রামনারায়ণ রায় চৌধুরীর কন্যা সারদা দেবীকে বিয়ে করেন। মামাবাড়ির সূত্র ধরে এই দক্ষিণডিহি গ্রামে ১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর বাংলা ২৪শে অগ্রহায়ণ ১২৯০ সনে বেনী মাধব রায় চৌধুরী ও দাক্ষায়নী দেবীর একমাত্র কন্যা ভবতারিণী দেবী ওরফে পদ্ম ওরফে ফুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়। তখন কবির বয়স ছিল ২২ বছর। আর ভবতারিণী দেবীর বয়স মাত্র ১১ বছর। বিয়ের পর ভবতারিণী দেবীর নতুন নাম রাখা হয় মৃণালিনী দেবী। মজার কথা হলো, রবীন্দ্রনাথকে বিয়ে করতে শ্বশুরবাড়ি আসতে হয়নি। কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের ছেলে রবীন্দ্রনাথের ঘরেই সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশে বিয়ে হয়েছিল। কবির বিবাহিত জীবন ছিল মাত্র ১৯ বছর। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে ৩০ বছর বয়সে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় (১৮৭৩-১৯০২ খ্রি.), রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪১। কবির দুই পুত্র ও তিন কন্যা সন্তান ছিল। পুত্রদ্বয় হলেন রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ আর ৩ কন্যা মাধুরীলতা বা বেলা, রেনুকা বা রানী এবং মীরা বা আতশী। ছোটো ছেলে শমীন্দ্রনাথ ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১৩ বছর বয়সে কলেরায় মারা যান (১৮৯৪-১৯০৭ খ্রি.), কন্যা রেনুকা বা রানীও ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মারা যান (১৮৯০-১৯০৩ খ্রি.) এবং মীরা বা অতশীও অল্প বয়সে মারা যান। বড়ো মেয়ে মাধুরীলতা বা বেলা তাঁর মায়ের মতো মাত্র ৩০ বছর বয়সে অকালে মৃত্যুবরণ করেন (১৮৮৬-১৯১৬ খ্রি.)। মাধুরীর বিয়ে হয়েছিল বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর ছেলের সঙ্গে। মাধুরীলতা বা বেলা সুন্দর কবিতা লিখতেন। তার মৃত্যুর পরে কবিতা ও চিঠিপত্রাদি নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ো পুত্র রথীন্দ্রনাথ কৃষি ও ফলিত বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। বাবার আশীর্বাদপুষ্ট রথীন্দ্রনাথ শিক্ষা ও ত্যাগের দ্বারা মহৎ জীবন গড়ে তোলেন। তিনি আজীবন শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব পালন করেন। অবসরে ছবি এঁকে জগদ্বিখ্যাত হন। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন মনেপ্রাণে একজন বিজ্ঞানী ও চিত্রশিল্পী। বাবার মৃত্যুর পরে তিনি বিশ্বভারতীর দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৩২ সালে কলকাতার চৌরঙ্গী আর্ট স্কুলে তার ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়। রথীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের একক প্রদর্শনী ১৯৪৮ সালে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু উদ্‌বোধন করেন। তিনি বাংলা ভাষায় অনেক মূল্যবান বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। রথীন্দ্রনাথ ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (১৮৮৮-১৯৬৪ খ্রি.)।

শিশু রবীন্দ্রনাথকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো কিন্তু স্কুলের পড়াশুনায় তাঁর মন বসে না। বাড়ির মতো স্কুলও তাঁর কাছে বন্দিজীবন মনে হয়। স্কুলের খাতায় শিশু কবি লিখলেন–

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলি দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে–
হাপুসহুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

১৮৭৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' Ag„ZevRvi পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ebdzj প্রকাশিত

হয়। কবির বয়স যখন ১৬ বছর তখন প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ fvbywms‡ni c`vejx। ১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যান ব্যারিস্টারি পড়তে। বিলেতে বসে fviZx পত্রিকায় নিয়মিত লেখা পাঠাতেন। এই সময় fMœü`q নামে একটি গীতিকাব্যও লেখেন। দেশে ফিরে এসে একটি চমৎকার ভ্রমণকাহিনি লেখেন– BD‡ivc hvÎxi WvBix।

mšÍvb‡`i mv‡_ Kwe¸iæ

স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ তাঁর হয়নি কিন্তু স্বশিক্ষা ও সাধনায় তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বসভায় সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯১২ সালে MxZvÄwj কাব্যগ্রন্থের ৫৩টি এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের ৫০টি– এই ১০৩টি গীতিকবিতা নিজ হাতে ইংরেজিতে অনুবাদ করে এর নাম দিলেন ms Advwis। ঠিক এর পরের বছর *Song offering* গ্রন্থের জন্য কবিকে দেওয়া হলো সাহিত্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল পুরস্কার'। ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর সুইডিশ একাডেমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। সেসময় নোবেল পুরস্কারের অর্থ মূল্য ছিল ১ লাখ ৪৩ হাজার ১০ সুইডিশ ফ্রাঙ্ক বা ১ লাখ ৮ হাজার টাকা। সেদিন দুনিয়াজোড়া তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর দেশে দেশে তাঁকে দেওয়া হয় বিরল সংবর্ধনা। বাংলার কবি হলেন কবিদের কবি, কবিগুরু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভ্রমণে আলবার্ট আইনস্টাইন, হেনরি বার্গসন, জর্জ বার্নার্ড শ, টমার্স মান, রবার্ট ফস্ট, বেনিতো মুসোলিনি, এইচ জিওয়েলস, রোমা রোঁলা প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, মনীষী ও রাজন্যবর্গের সাথে হয় তাঁর সম্পর্কের সেতুবন্ধ। ১৮৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৪ সালের ২৮শে জুন পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর আঁকা ছবি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ৮ বছর বয়স থেকে সুদীর্ঘ বাহাত্তর বছরের সাহিত্য জীবনে যেমন বড়োদের জন্য গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, নাটক, গীতিনাট্য, স্মৃতিকথা ইত্যাদি লিখেছেন তেমনি শিশুদের ভালোবেসে তাদের মনের কথা, স্বপ্নের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষা কল্পনার রংতুলিতে এঁকেছেন ছবি। লিখেছেন mnRcvV-1, mnRcvV-2, wkï, wkï †fvjvbv_, LvcQvov, Qov I Qwe, Mí-¯^í, Qov, †Q‡j‡ejv প্রভৃতি। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এক মলাটে চমৎকার সংগ্রহ iex›`ª wkïmvwnZ¨ প্রকাশ করেছে। ৫৬টি কাব্যগ্রন্থ, ৪টি গীতিগ্রন্থ, ১১৯টি ছোটোগল্প, ২০টি প্রবন্ধ, ১২টি উপন্যাস, ১৩টি পত্রগ্রন্থ, ৯টি ভ্রমণকাহিনি, ১৯টি কাব্যনাট্য, ২৯টি নাটক, ২২৩৫টি গান ও প্রায় ২০০০টি আঁকা ছবি কবির অমর সৃষ্টি। এছাড়াও তিনি ২৯৮টি বিলুপ্তপ্রায় লালনগীতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা ২৯ খণ্ডে iex›`ª iPbvejx শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশে জমিদারির দায়িত্ব পালন করেন কুষ্টিয়ার শিলাইদহে, রাজশাহীর পতিসরে ও পাবনার শাহজাদপুরে। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলঙ্কা– এই তিন প্রতিবেশী দেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', ভারতের জাতীয় সংগীত 'জনগণ মন অধিনায়ক...', এবং শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংগীত 'নমঃ নমঃ নমঃ' কবির লেখা ও সুর করা। এমন গৌরবের অধিকারী সেতো আর কেউ নন, আমাদের প্রিয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই

কবি মানবের মাঝে বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন। আবারো কবিকে বলতে শুনি–

যেতে নাহি দিব হায়,
তবু যেতে দিতে হয়
তবু চলে যায়।

কবি আরো গেয়েছেন–

যদি তোর ডাক শুনে
কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে...

৮০ বছর বয়সে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ নিঃসঙ্গ কবি চলে যান পরপারে। সেদিন শ্রাবণের আকাশ চোখে ছিল বিদায় অশ্রু।

লেখক: কবি, সাহিত্যিক ও সম্পাদক

২রা মে

সত্যজিৎ রায়ের ৯৭তম জন্মবার্ষিকী

আপন চৌধুরী

সত্যজিৎ রায় একজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্রকার, কিংবদন্তি লেখক ও চিত্রকর। অস্কার জয়ী প্রথম ও একমাত্র বাঙালি পরিচালক। তাঁর চলচ্চিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে এক ধরনের স্থিরতা, সূক্ষ্মতা ও কাব্যিকতা। সত্যজিতের কাজে প্রাধান্য পেয়েছে পশ্চিমা ছবির পরিমিতিবোধ। তাঁর প্রায় সব ছবিতেই ইতালিয়ান নিউরিয়ালিজম ধারা প্রকাশ পায়। এই ধারার পরিচালকরা কোনো লেখকের রচনা হুবহু অনুকরণে আগ্রহী নন। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে সাহিত্যভিত্তিক কাহিনিকে পরিবর্তন বা সংযোজন

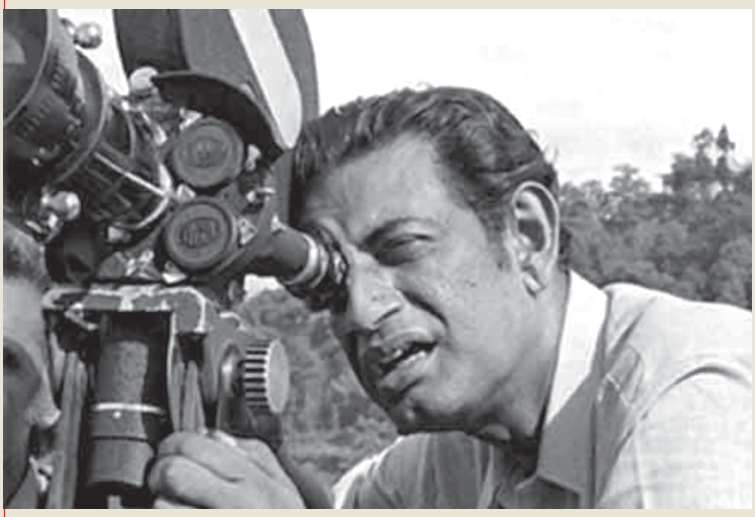

mZ¨wRr ivq

করেন, যাতে স্পষ্ট দৃশ্যমান হয় পরিচালকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টিশীলতা। তাঁর ছবি ছিল উদার মানবতাবাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। তিনি প্রায় ছবি শেষ করেছেন আশা দেখানোর মাধ্যমে। বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) বিশ্বের দরবারে প্রথম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অর্জন করেছেন বহু পুরস্কার ও সম্মাননা। পেয়েছেন খ্যাতিমান চলচ্চিত্র পরিচালকের মর্যাদা।

বিশ্ববিখ্যাত এই পরিচালকের জন্ম ১৯২১ সালের ২রা মে উত্তর কলকাতার গড়পার রোডে। সুকুমার রায় ও সুপ্রভা রায়ের একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়ের দাদা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) ও বাবা সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) উভয়ের জন্ম বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার মসুয়া গ্রামে। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে রায় চৌধুরী পরিবারটি কলকাতায় চলে যায়। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ছিলেন একজন প্রখ্যাত লেখক, শিশু সাহিত্যিক, চিত্রকর এবং শিশুতোষ পত্রিকা m‡›`k (১৯১৩)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সত্যজিৎ রায়ের পিতা সুকুমার রায়ও ছিলেন ছড়াকার ও শিশু সাহিত্যিক। পারিবারিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠা সত্যজিতের লেখায় এবং চলচ্চিত্রে যথেষ্ট মেধা ও মননের পরিচয় পাওয়া যায়। জন্মের মাত্র দুই বছরের মাথায় পিতার মৃত্যুর পর দেনায় জর্জরিত হয়ে বিক্রি করতে হয় কলকাতার বাড়ি। ১৯২৬ সালে সত্যজিৎ ও তাঁর মা আশ্রয় নেন মামার বাড়ি। ওখানেই শুরু হয় সত্যজিতের লেখাপড়া। ১৯২৮ সালে মায়ের সাথে গিয়ে দেখা করেন রবীন্দ্রনাথের সাথে। ১৯৩০ সালে সত্যজিৎকে ভর্তি করা হয় বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। সত্যজিৎ রায়ের জীবনে তাঁর মা সুপ্রভা রায়ের প্রভাব অপরিসীম। মায়ের প্রসঙ্গে সত্যজিৎ লিখেছেন, 'মায়ের জীবনটা স্ট্রাগলে ভরা। আমাদের ব্যবসা উঠে গেল। পৈত্রিক বাড়ি ছাড়তে হলো, কিছুই নেই। ছোটো মামা দয়া করে একটু আশ্রয় দিলেন। লেডি অবলা বসুকে ধরে মা চাকরি নিলেন বিদ্যাসাগর রাণী ভবনে। সেলাইটা জানতেন তাই রক্ষে। অ্যাম্ব্রডারি করে আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করার জন্য মা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতেন। আমার মায়ের গুণের শেষ নেই। মডেলিং শিখেছিলেন নিতাই মল্লিকের কাছে। পেইন্টিং শিখেছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা কাজ করার আদর্শ আমি মার কাছ থেকে পেয়েছি। চৌদ্দ বছরে যে ম্যাট্রিক পাস করি সেও মায়ের জন্যে।'

সত্যজিতের মামাবাড়িতে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশ। গানবাজনা, ছবি আঁকার পাশাপাশি ক্যামেরার কাজও শিখে ফেলেন তিনি। ১৯৩৬ সালে ক্যামেরায় ছবি তুলে পুরস্কার পান। ম্যাট্রিক পাসের পর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে। ১৯৪০ সালে চিত্রকলা শিক্ষার জন্য ভর্তি হন শান্তিনিকেতনে। ১৯৪৩ সালে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে যোগ দেন একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায়। ওখানে বিজ্ঞাপনের ভাষা ও ডিজাইনে প্রচ্ছদ প্রকাশনায় যোগ করেন নতুন মাত্রা। ১৯৪৮ সালে সত্যজিৎ রায় কলকাতায় গঠন করেন 'ফিল্ম সোসাইটি'। এই সোসাইটির মাধ্যমে ধ্রুপদী চলচ্চিত্র দেখা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হন। ১৯৫০ সালে সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞাপন এজেন্সির চাকরিসূত্রে লন্ডনে বদলি হন। ওখানে অবস্থানকালে ইতালিয়ান পরিচালক ভিত্তোরিও ডিসিকার `¨v evBmvB‡Kj _xem& (১৯৪৭) দেখে মুগ্ধ হন এবং বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) মুক্তি লাভ করে। এরপর বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন তিনি।

সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধ সংগ্রহ থেকে জানা যায়, ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই মহান চলচ্চিত্র শিল্পী বাংলাদেশে আসেন। বক্তৃতা করেছিলেন পল্টন ময়দানে। তিনি বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে বলেন, 'বহুদিন থেকে শহিদ দিবসের কথা শুনে আসছি। একুশে ফেব্রুয়ারির কথা শুনে আসছি। কিন্তু এখানে এসে নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না আপনারা বাংলা ভাষাকে কতখানি ভালোবাসেন। বাংলা ভাষা যখন বিপন্ন, তাকে বাঁচানোর জন্য যে সংগ্রাম হয়েছিল, তাতে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের যে কতখানি শ্রদ্ধা করেন আপনারা, তাঁদের স্মৃতিকে– সেটা আমি আজকে এখানে এসে বুঝতে পারছি। আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গে থাকি, আমরাও বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি। এটা ঠিক যে, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির মধ্যে আর পাঁচ রকম সংস্কৃতির প্রভাব এসে পড়ে সেটাকে একটা পাঁচমিশালি ভাব এনে দিয়েছে। ইংরেজির প্রভাব আমরা এখনো পশ্চিমবঙ্গে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তার একটা কারণ এই বোধ হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ হলো ভারতবর্ষের একটা প্রাদেশিক অংশমাত্র। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, আমরা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি না। বাংলা সাহিত্য, বাংলা গান, বাংলা চলচ্চিত্র, বাংলা থিয়েটার– এসবই পশ্চিমবঙ্গে এখনো বেঁচে আছে, টিকে আছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এঁদের আমরা এখনো ভালোবাসি। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে, আমি আজ ২০ বছর ধরে বাংলা ছবি করছি। এরমধ্যে বহুবার বহু জায়গা থেকে অনুরোধ এসেছে যে আমি বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা পরিত্যাগ করে অন্য দেশে, অন্য ভাষায় চিত্র রচনা করি। কিন্তু আমি সেই অনুরোধ বার বার প্রত্যাখ্যান করেছি। কারণ আমি জানি, আমার রক্তে যে ভাষা বইছে, সে ভাষা হলো বাংলা ভাষা। আমি জানি সেই ভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষায় কিছু করতে গেলে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। আমি কূলকিনারা পাব না ও শিল্পী হিসেবে আমি মনের জোর হারাবো।'

সত্যজিৎ রায় সর্বমোট ৩৬টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর অধিকাংশ চলচ্চিত্র ছিল শিল্প-সাহিত্য নির্ভর। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রকে নতুনভাবে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করেন। তিনি পেয়েছেন অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা। তাঁর পুরস্কার ও সম্মাননার বিবরণ তুলে ধরা হলো:

Pjw"P‡Î cÖvß cyi¯‹vi

c‡_i cuvPvjx (1955)

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৫৬। শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল, কান, ১৯৫৬। ডিপ্লোমা অব মেরিট, এডিনবার্গ, ১৯৫৬। গোল্ডেন কারবাও, ম্যানিলা, ১৯৫৬। ভ্যাটিকান পুরস্কার, রোম, ১৯৫৭। শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, সানফ্রান্সিসকো, ১৯৫৭। সেলজনিক গোল্ডেন লরেল, বার্লিন, ১৯৫৭। শ্রেষ্ঠ ছবি, ভ্যাঙ্কুবার, কানাডা, ১৯৫৮।

সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি, স্টাটফোর্ড, কানাডা, ১৯৫৮। শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি, আফ্রো আর্টস থিয়েটার, নিউইয়র্ক, ১৯৫৯। শ্রেষ্ঠ অ-ইউরোপীয় ছবি হিসেবে বদিল পুরস্কার, ডেনমার্ক, ১৯৬৬। শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি, কিনিমা জামপো পুরস্কার, টোকিও, ১৯৬৬। অপু-ত্রয়ীর প্রতিটির জন্য উইংটন পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০।

AcivwRZv (1956)

গোল্ডেন লায়ন অব সেন্ট মার্ক, ভেনিস ফিল্ম উৎসব, ১৯৫৭। সিনেমা ন্যুভো, ভেনিস, ১৯৫৭। সমালোচকদের পুরস্কার, ভেনিস, ১৯৫৭। সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, সানফ্রান্সিসকো, ১৯৫৮। শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবির জন্য গোল্ডেন লরেল, আমেরিকা, ১৯৫৮। সেলজনিক গোল্ডেন লরেল, বার্লিন, ১৯৬০। শ্রেষ্ঠ অ-ইউরোপীয় ছবি হিসেবে বদিল পুরস্কার, ডেনমার্ক, ১৯৬৭। অপু-ত্রয়ীর প্রতিটির জন্য উইংটন পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০।

RjmvNi (1958)

রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৫৮। সংগীতের জন্য রৌপ্যপদক, মস্কো, ১৯৫৯।

Acyi msmvi (1959)

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৫৯। শ্রেষ্ঠ মৌলিক ও আবেগপ্রবণ ছবি হিসেবে সাদারল্যান্ড পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০। ডিপ্লোমা অব মেরিট, এডিনবার্গ, ১৯৬০। শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি, ন্যাশনাল বোর্ড অব রিভিউ অব মোশন পিকচারস, আমেরিকা, ১৯৬০। অপু-ত্রয়ীর প্রতিটির জন্য উইংটন পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০।

†`ex (1960)

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬০।

wZbKb¨v (1961)

সমাপ্তি'র জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৬১। সমাপ্তি ও পোস্ট মাস্টারের জন্য মেলবোর্ন ট্রফি: গোল্ডেন বুমেরাং (গ্রাঁ পি), মেলবোর্ন, ১৯৬২। সেলজনিক গোল্ডেন লরেল, বার্লিন, ১৯৬৩।

Awfhvb (1962)

রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৬২।

gnvbMi (1963)

সার্টিফিকেট অব মেরিট, ভারত, ১৯৬৩। শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে রৌপ্য ভালুক, বার্লিন, ১৯৬৪।

PviæjZv (1964)

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬৪। শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে রৌপ্য ভালুক, বার্লিন, ১৯৬৫। ক্যাথলিক পুরস্কার, বার্লিন, ১৯৬৫। শ্রেষ্ঠ ছবি আকাপুলকো, মেক্সিকো, ১৯৬৫।

bvqK (1966)

রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৬৬। রাষ্ট্রপতির পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য ও কাহিনি, ভারত, ১৯৬৬। বিশেষ জুরি পুরস্কার, বার্লিন, ১৯৬৬। ইউনিক্রিট সমালোচকদের প্রদত্ত পুরস্কার, বার্লিন, ১৯৬৬।

wPwoqvLvbv (1967)

শ্রেষ্ঠ পরিচালক, ভারত, ১৯৬৭।

¸cx MvBb evNv evBb (1969)

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬৯। রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, ভারত, ১৯৬৯। শ্রেষ্ঠ পরিচালক, সিলভার ক্রস পুরস্কার, অ্যাডিলেড, ১৯৬৯। শ্রেষ্ঠ মৌলিক ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক, অকল্যান্ড, ১৯৬৯। মেরিট অ্যাওয়ার্ড, টোকিও, ১৯৭০। শ্রেষ্ঠ ছবি, মেলবোর্ন, ১৯৭০।

cÖwZØ›Øx (1970)

রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৭০। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি, ভারত, ১৯৭০। বিশেষ পুরস্কার, ভারত, ১৯৭০।

mxgvex (1971)

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৭২। এফআইপি আরইএসসিআই (চলচ্চিত্র সমালোচকদের) পুরস্কার, ভেনিস, ১৯৭২।

Akwb ms‡KZ (1973)

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৭৩। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক, ভারত, ১৯৭৩। গোল্ডেন হুগো, শিকাগো, ১৯৭৩। শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য স্বর্ণ ভালুক, বার্লিন, ১৯৭৪।

†mvbvi †Kjøv (1974)

রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৭৪। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য, ভারত, ১৯৭৪। শ্রেষ্ঠ ছবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৪। শ্রেষ্ঠ পরিচালক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৪। শিশু ও কিশোরদের জন্য শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র, গোল্ডেন স্ট্যাচু পুরস্কার, তেহরান, ১৯৭৫।

Rb AiY¨ (1975)

শ্রেষ্ঠ পরিচালক, ভারত, ১৯৭৫। শ্রেষ্ঠ ছবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫। শ্রেষ্ঠ পরিচালক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫। কালেভি ভ্যারি পুরস্কার, ১৯৭৬।

kZiÄ †K wLjvwo (1977)

শ্রেষ্ঠ হিন্দি ছবি, ভারত, ১৯৭৭।

Rq evev †djybv_ (1978)

শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্র, ভারত, ১৯৭৮। গোল্ডেন হুগো, শিকাগো, ১৯৭৯। বিশেষ পুরস্কার, সাইপ্রাস ফিল্ম উৎসব, ১৯৮০।

nxiK ivRvi †`‡k (1980)

রাষ্ট্রপতির পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক, ভারত, ১৯৮০। এছাড়া ছবিটি অন্য একটি দেশের পুরস্কার পায়।

MYkÎæ (1989)

শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি, ভারত, ১৯৮৯।

Z_¨wP‡Îi Rb¨ cyi¨‹vi

iex›`ªbv_ (1961)

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬১। শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে গোল্ডেন শীল, লোকার্নো, ১৯৬১।

`‴ Bbvi AvB (1972)

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৭২।

e¨w³MZ cyi¨‹vi I m¤§vbbv

রঞ্জি স্টেডিয়ামে নাগরিক সংবর্ধনা, ১৯৫৭। পদ্মশ্রী, ১৯৫৮। সংগীত অ্যাকাডেমি পুরস্কার, ১৯৫৯। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ১৯৬০। বার্লিন ফিল্ম উৎসবের বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান, ১৯৬১। টাইম পত্রিকার মতে, বিশ্বের সেরা ১১ জন পরিচালকের অন্যতম, ১৯৬৩। পদ্মভূষণ, ১৯৬৫। স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড অব অনার, বার্লিন ফিল্ম উৎসব, ১৯৬৬। ম্যাগস্যাসে পুরস্কার, ম্যানিলা, ১৯৬৭। স্টার অব যুগোস্লাভিয়া, ১৯৭১। আনন্দ সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৭৩। ডিলিট, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩। ডিলিট, রয়াল কলেজ অফ আর্টস, লন্ডন, ১৯৭৪। পদ্মবিভূষণ, ভারত, ১৯৭৬। ডিলিট, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮। বিশেষ পুরস্কার, বার্লিন ফিল্ম উৎসব, ১৯৭৮। বিশেষ পুরস্কার, মস্কো ফিল্ম উৎসব, ১৯৭৯। ডিলিট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০। শিশির কুমার (শিশু সাহিত্য) পুরস্কার, ১৯৮১। হোমেজ অফ সত্যজিৎ রয়, কান ফিল্ম উৎসব, ১৯৮২। স্পেশাল গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক, ভেনিস ফিল্ম উৎসব, ১৯৮২। বিদ্যাসাগর পুরস্কার (শিশু সাহিত্য), ১৯৮২। ফেলোশিপ অফ ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট, ১৯৮৩। দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, ভারত, ১৯৮৫। ডিলিট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫। সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার, ১৯৮৬। সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির ফেলোশিপ, ১৯৮৬। কলকাতা পৌরসভা কর্তৃক নাগরিক সংবর্ধনা, ১৯৮৬। ওজিয়ঁ দ'নর ফ্রান্স, ১৯৮৭। দাদাভাই নওরজি মেমোরিয়াল পুরস্কার, ১৯৮৭। 'টিনটোরেটোর যীশু' গ্রন্থটির জন্য শিশু সাহিত্য পুরস্কার, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ ট্রেনিং, ভারত, ১৯৮৭। সেরা বিদেশি ছোটো গল্পের জন্য পুরস্কার, এফএনএসিএস, ফ্রান্স, ১৯৮৯। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পুরস্কার, অসম সরকার, ১৯৮৯। শিরোমণি পুরস্কার, এশিয়ান পেইন্টস, ১৯৯০। ৭০তম জন্মবার্ষিকীতে নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট-এর চলচ্চিত্র বিভাগ একটি ফলক উপহার দেয়, ১৯৯১। বিখ্যাত পরিচালক হিসেবে অর্জন করেন বিশেষ অস্কার পুরস্কার, ১৯৯২।

অস্কার জয়ী প্রথম ও একমাত্র বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় ১৯৯২ সালের ২৩শে এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

লেখক: চলচ্চিত্র গবেষক

কাজী নজরুল ইসলামের সৈনিক জীবন

ম. মীজানুর রহমান

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগস্রষ্টা মহাকবি তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিদ্রোহী ও বৈপ্লবিক চেতনার অনন্যসাধারণ রূপকার কাজী নজরুল ইসলামের সৈনিক জীবন ছিল বর্ণাঢ্য। একাধারে তিনি একনিষ্ঠ সৈনিক অন্যদিকে সাহিত্য ও কাব্যপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। সুসাহিত্যিক আবদুল কাদির bRiæj cÖwZfvi ¯^ifc গ্রন্থে (পৃ. ২৫) লিখেছেন, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গাব্দে) নজরুল ক্লাশ টেনের ছাত্র; ষান্মাসিক পরীক্ষার প্রাক্কালে তিনি লক্ষ্য করেন যে, শহরের দেয়ালে দেয়ালে রকমারি প্রাচীরপত্র এঁটে দিয়ে বাঙ্গালি যুবকদের সৈন্যদলে যোগ দিতে আহবান করা হয়েছে।'

^mwbK †e‡k bRiæj

নজরুল এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। তিনি রিক্রুট হন ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে। নজরুল কলকাতা হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে লাহোর হয়ে যান নওশেরায়। এই নওশেরাতেই তাঁর প্রশিক্ষণ চলে তিন মাস। তাঁর পোস্টিং হয় করাচিতে। অসামান্য প্রতিভাবলে আপন কর্মদক্ষতায় অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এটা ছিল তাঁর সেনাবাহিনীর রসদ ভাণ্ডারের দায়িত্ব। ফলে সরাসরি তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়নি। এই সুযোগে তিনি অবাধে সাহিত্যচর্চা করার সুযোগ পান।

ভয়াবহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল সত্ত্বেও নজরুল কাব্যসাহিত্য ও জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখেন। আর এখানেই তিনি বাঙালি পল্টনের পাঞ্জাবি মৌলবি সাহেবের কাছে ফারসি সাহিত্য অধ্যয়ন করার অবাধ সুযোগ পান।

সেনাবাহিনীতে চাকরিকালেই তিনি তৎকালের কলকাতায় প্রকাশিত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকায় কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলি লিখে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাঁর সরস রচনাবলি প্রকাশের সুবাদে তৎকালের পত্রিকাসমূহ তথা mIMvZ, e½xq gymjgvb mvwnZ¨ cwÎKv, cÖevmx, †gvm‡jg fviZ রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত এবং নজরুল একাডেমি প্রকাশিত bRiæj-¯§„wZPviY গ্রন্থের ২৫৪, ২৫৫ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ 'আমার দেখা নজরুল' থেকে প্রসঙ্গত উদ্ধৃতি দিচ্ছি... 'হজরত মোহাম্মদও (সা.) বলেছিলেন, 'খায়রুন নাসে মাইয়ান-কায়ুননাস' অর্থাৎ 'পরোপকারী মানুষই শ্রেষ্ঠতম মানুষ'। আমরা ভুলে গেছি সে আদর্শ। পরোপকার নয়, পরনিন্দার নীচতা এবং পরশ্রীকাতরতাই বোধ হয় আজ আমাদের প্রধান ধাত। এ বিষয়ে নজরুলের একটি ছোট্ট মোনাজাত (RvMiY: ১৯৪১, অক্টোবর)–

আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হতে বাঁচাও, প্রভু, উদার!
হে প্রভু! শেখাও, নীচতার চেয়ে নীচ পাপ নাহি আর!!
যদি শতেক জন্মপাপে হই পাপী,
যুগ যুগান্ত নরকেও যাপি,
জানি জানি প্রভু! তারো আছে ক্ষমা-
ক্ষমা নাই নীচতার।
ক্ষুদ্র করো না, হে প্রভু, আমার হৃদয়ের পরিসর,
(যেন) হৃদয়ে আমার সম ঠাঁই পায় শত্রু-মিত্র-পর।
নিন্দা না করি ঈর্ষায় কারো
অন্যের সুখে সুখ পাই আরো
কাঁদি তারি তরে অশেষ দুঃখী
ক্ষুদ্র আত্মা যার।

১৯১৯ সালে বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, ৪৯ নম্বর বঙ্গবাহিনী ভেঙে দেওয়ার পর হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম ফিরে আসেন কলকাতায়, আড্ডা জমান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিস ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে, কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদ এবং প্রকাশোন্মুখ gvwmK †gvm‡jg fvi‡Zi কার্যকরী সম্পাদক জনাব আফজাজুল হক সাহেবদের সাথে। করাচি সেনানিবাস থেকে প্রেরিত হাবিলদার নজরুলের নানা লেখা, কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প নানা সাময়িকীতে প্রকাশিত হওয়ায়, এই সৈনিক-সাহিত্যিকের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতায় আসার পর তাঁর প্রাণখোলা হাসি, হরদম হারমোনিয়াম যোগে গানবাজনা, প্রাণপ্রাচুর্যে সমুজ্জ্বল, ফুর্তিবাজি এবং অভূতপূর্ব সাহিত্য-প্রতিভা সমন্বিত কলমবাজি ও অন্যবিধ কার্যকলাপের কল্যাণে, স্বল্পদিনের মধ্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনকে গুলজার করে তুললেন। বাংলা সাহিত্যের আকাশ ঝলমল করে উঠল।

আমাদের বড়ো অহংকার এই মহান বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামই আজ আমাদের মহান জাতীয় কবি এবং আমরা মনে করি তিনি শুধু বাংলাদেশেরই কবি নন, তিনি মহাবিশ্বের মহাকবি।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

২৮শে মেঃ নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস

নাহিদা সুলতানা

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৮৭ সালে, কেনিয়ার নাইরোবিতে উন্নয়ন সহযোগীদের বৈঠকে। ১৯৮৭ সাল থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন দেশে ২৮শে মে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। দিবসটি সারাবিশ্বে নারী স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালিত হলেও এর মূল উদ্দেশ্য মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ প্রসব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, মা-পরিবার ও সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতকরণ।

gv I wkï

নারীর চিরন্তন পরিচয় মা এবং মা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শব্দ। বংশানুক্রম ধারা টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই বর্তেছে নারীর ওপর। কারণ নারীর পূর্ণতা আসে মাতৃত্বে। প্রতিবছর সারাবিশ্বে ২১ কোটি নারী গর্ভবতী হয় এবং ২ কোটিরও বেশি নারী গর্ভজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে। এদের মধ্যে ৮০ লাখের জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই জটিলতায় ভোগার আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত ধনীদের তুলনায় প্রায় ৩০০ গুণ বেশি।

মাতৃত্বের বিষয়টিকে ঘিরে আমরা এখনো বিপরীতমুখী দুটি আলাদা স্রোতের মুখোমুখি হতে থাকি। একদিকে আছে সঠিক চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে ধারণার অভাব এবং নানারকম কুসংস্কার। বিএমএমএস ২০১০-এর তথ্যানুযায়ী গর্ভকালীন শতকরা ১৫ জন নারীই নানাবিধ জটিলতায় ভোগেন, যা মাতৃমৃত্যুর জন্য বহুলাংশে দায়ী। প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ, খিচুনি, গর্ভকালীন জটিলতা, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা ও পরিবারের অবহেলা মাতৃমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হলেও শতকরা ৫১ ভাগ মৃত্যুই মূলত রক্তক্ষরণ ও খিচুনির কারণে হয়ে থাকে। এসব মোকাবিলা করতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ছাড়াও সকল জেলা সদর হাসপাতাল, শিশু ও মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি প্রসূতি সেবা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে আরো জানা যায়, বাংলাদেশে শতকরা ৬৮ ভাগ গর্ভবতী নারী ১টি প্রসবপূর্ব সেবা এবং ২৬ ভাগ নারী ৪টি প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণ করে থাকেন। দেশে বর্তমানে প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণের হার ৬৪%, একে শতভাগে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চলছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, মেয়েদের কমপক্ষে ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রয়োজন। যা বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে কার্যকর করেছে। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় সন্তান জন্মদানের আগেই ছুটি নেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু বেসরকারী কর্মজীবী নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া কর্মজীবী নারীদের, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের গর্ভাবস্থায় অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়। ফলে মা ও শিশুর জীবন পড়ে যায় ঝুঁকির মুখে।

বাংলাদেশে গর্ভধারণের ৪২ দিন থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত দুর্ঘটনা ছাড়া মায়ের মৃত্যুকে মাতৃমৃত্যু বলা হয়। মৃত্যুর পরোক্ষ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যানসার, স্থূলতা, যক্ষ্মা, রক্তস্বল্পতা, হেপাটাইটিস বি, ২০ বছরের কম বা ৩৫ বছরের বেশি বয়সে সন্তান নেওয়া, এইচআইভি এইডস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি। ইউএনএফপি-এর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত এক সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে প্রসবজনিত ফিস্টুলায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৬৯ জন। আর এ ফিস্টুলার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হলো জরুরি প্রসূতি সেবাপ্রাপ্তি ও দক্ষ ধাত্রীর অভাব। মাতৃস্বাস্থ্য এবং নবজাতকের মৃত্যু হার কমিয়ে আনা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি)-এর অন্যতম একটি অংশ। এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে সফল। ২০০৫ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল প্রতি লাখে ২৩৩ জন, ২০১৪ তে সেই হার ১৯৪। এমডিজি'র আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে ১৪৩-এ নামিয়ে আনা এবং এসডিজি'র আওতায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৭০ জন। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যু ১৩৭ জনে নেমে এসেছে।

Mf©Kvjxb mgq hv KiYxq

১. গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে ৪ বার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বা মা ও শিশু হাসপাতালে এসে শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে।

২. গর্ভধারণের ৪ থেকে ৮ মাসের মধ্যে মাকে ২ ডোজ টিটি টিকা নিতে হবে।

৩. স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি করে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে। (খাবার তালিকায় দুধ, ডিম, ফলমূল, শাকসবজি, শিম, মাছ ইত্যাদি)

৪. প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে।

৫. ভারী কাজ ছাড়া অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্ম করা যাবে।

৬. দিনের বেলায় কমপক্ষে ২ ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হবে।

৭. গর্ভবতী মাকে মানসিকভাবে শান্তিতে রাখতে হবে।

Mf©Kvjxb wec`wPý: hv †`Lv w`‡j m‡½ m‡½ wPwKrm‡Ki mvnvh¨ wb‡Z n‡e

১. রক্তস্রাব: গর্ভাবস্থায় প্রসবের সময় বা পরে খুব বেশি রক্তস্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, প্রসবের পর গর্ভফুল না পড়া।

২. মাথাব্যথা ও চোখে ঝাপসা দেখা ও গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা পরে পানি আসা।

৩. তিনদিনের বেশি জ্বর থাকা।

৪. প্রসব ব্যথা ১২ ঘণ্টার বেশি থাকা ও প্রসবের সময় শিশুর মাথা ছাড়া অন্য কিছু আগে বের হওয়া।

৫. গর্ভাবস্থায় প্রসবের সময় বা পরে খিঁচুনি হওয়া।

wbivc` cÖme cwiKíbvi Rb¨ hv KiYxq

১. কোথায় কাকে দিয়ে প্রসব করানো হবে তা আগে থেকে ঠিক করে রাখা।

২. রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে আগে থেকে ২-৩ জন রক্তদাতা ঠিক রাখতে হবে।

৩. জরুরি অবস্থায় গর্ভবতীকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪. প্রসবকালীন খরচের জন্য গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই প্রয়োজনীয় টাকা জমিয়ে রাখতে হবে।

সারাবিশ্বে দিবসটি 'আন্তর্জাতিক নারী স্বাস্থ্য দিবস' হিসেবে পালিত হলেও মাতৃস্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব ও এর কার্যকারিতা অনুধাবন করে ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার অনেক উন্নয়নশীল কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ১.৫ শতাংশে কমিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়াও সরকারের উদ্যোগে ১৩,১৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকে বিনামূল্যে মাতৃসেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের একটি, যা অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে। দেশের নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ব্যবস্থা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, পরিবেশ উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের মডেল হিসেবে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসে আমাদের চাওয়া– সবার মধ্যে সচেতনতা বাড়বে, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে। সব শ্রেণির মানুষ এই অধিকার পাবে, তাহলে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালন সার্থক হবে। নারীর জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হোক এবং সংরক্ষিত হোক নারীর অধিকার– এটাই এবারের নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের প্রত্যাশা।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বিশ্ব মা দিবস

মায়ের অধিকার সন্তানের কাছে সবচেয়ে বেশি

সিনথিয়া পারভীন

পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম ডাকটি হচ্ছে 'মা'। প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার পালিত হয় 'বিশ্ব মা দিবস'। মায়ের মুখ দেখার পূর্বেই শিশু তার মায়ের সাথে পরিচিত হয়। শুধু পরিচিতই না মায়ের অস্তিত্বের সাথে তার অস্তিত্ব জড়িয়ে থাকে। সন্তানের চাওয়া-পাওয়া একমাত্র মা'ই বোঝেন। গর্ভাবস্থায় মা তার সুখ-শান্তি বিসর্জন দেন ভবিষ্যতের আগন্তুকের জন্য। ৯ মাস ১০ দিন অমানবিক কষ্ট সহ্য করার পর মা জন্ম দেন একটি শিশুর। সদ্যজাত এই সন্তানকে

ঘিরেই মায়ের যত স্বপ্ন। ভুলে যান নিজের সকল চাহিদা। দিন-রাত অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় পাহারা দেন শিশু সন্তানটিকে। ছোট্ট শিশুটির মনের কথা সবার আগে তিনিই বুঝতে পারেন। সন্তানের মুখের হাসির জন্য করতে পারেন সব কিছু। ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে কোলের ছোট্ট শিশুটি। ওর আধো আধো বুলিতে মা ডাকে মুছে যায় সমস্ত যন্ত্রণা। আত্মহারা হয়ে যান তার মুখের হাসিতে। সন্তান যতই তার শিশু নামটি ঘোচাতে থাকে, মায়ের সংগ্রাম ততই বেড়ে চলে। মা কোমর বেঁধে নামেন তাকে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। অনেক মা আছেন, সন্তানকে সময় দেওয়ার জন্য নিজের বহুল কাঙ্ক্ষিত চাকরিটি পর্যন্ত ছেড়ে দেন। স্বামী মারা গেলেও সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে ২য় বিবাহের কথা কল্পনাও করেন না। শিশু যখন তার শৈশব-কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার পরিসর বড়ো হতে থাকে, মায়ের সাথে দূরত্বও বাড়ে। আমরা ভুলেই যাই আমাদের জীবনে মায়ের অবদান কতটুকু। তার জায়গাটাই বা কোথায়?

একবার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর একজন সাহাবি প্রশ্ন করলেন– আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার দাবিদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবি আবার প্রশ্ন করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবি ৩য় বার প্রশ্ন করলেন, এরপর? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবি ৪র্থ বার একই প্রশ্ন করলে তিনি পিতার হক আদায়ের তাগিদ দেন। মায়ের অধিকার যে সন্তানের কাছে সবচেয়ে বেশি এটা বোঝাতেই তিনি তিন বার মা'র কথা বলেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আল-কোরানের সুরা আনকাবুতে আল্লাহ বলেছেন– 'আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি'। হাদিসে এসেছে নবি (সা.) বলেছেন- 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত'। মায়ের সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করে সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে– 'স্ববংশবৃদ্ধিকামঃ পুত্রমেকমাদাস্য...'। আবার সন্তান লাভের পর নারী তার রমণী মূর্তি পরিত্যাগ করে মহীয়সী মাতৃরূপে সংসারের কর্তৃত্ব করবেন। তাই 'মনু' সন্তান প্রসবিনী মাকে 'গৃহলক্ষ্মী' সম্মানে অভিহিত করেছেন। বলেছেন– 'উপধ্যয়ন দশাচার্য্য আচায্যাণাং শতং পিতা। সহগ্রন্ত পিতৃম্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে' (মনু, ২/১৪৫) অর্থাৎ দশজন উপাচার্য সমান একজন আচার্য্য (ব্রাহ্মণ), একশ আচার্য্য সমান পিতা, আর সহস্র পিতার সমান সম্মান মায়ের। অথচ আমাদের কাছে মায়ের অবস্থান কোথায় সেটা আমরা ভেবেও দেখি না। ভাবার সময়ই বা কোথায়? ইসলামসহ প্রতিটি ধর্ম যে মাকে এতটা সম্মান দিয়েছে, যে মা আমাদের জন্য ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছেন, নিজের চাহিদা ভুলে আমাদের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেই মাকে আমরা বৃদ্ধাশ্রমে রাখার কথা ভাবছি। এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা, মায়ের ভালোবাসা ও ত্যাগের প্রতিদান! অনেক সন্তানকে (সমাজের সম্ভ্রান্ত বলে পরিচিত) বলতে দেখি- 'সমস্যাটা কী? ওখানে (বৃদ্ধাশ্রমে) সমবয়সি অনেকের সাথে থাকলে তার মন ভালো থাকবে। স্বস্তির সাথে থাকবে। তাছাড়া আমাদের বাড়তি সময়ই বা কোথায়? মাকে দেখাশুনা করবো? তার চেয়ে বৃদ্ধাশ্রমই ভালো। টাকাতো সময়মতোই পাঠিয়ে দিই। মায়ের ভালো থাকার কথা ভেবেই প্রতিমাসে এতগুলো টাকা খরচ করছি। কেন যে উপজেলা পর্যায়ে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হচ্ছে না'। এ বিষয়ে পদক্ষেপ না নেওয়ায় সরকারের প্রতি তাদের ক্ষোভও কম নয়। সেই সুযোগ্য সন্তানটির উদ্দেশে বলছি– আপনি কি আদৌ জানেন, মা কিসে ভালো থাকেন? সন্তান-পরিজন ছেড়ে কোনো মা ভালো থাকতে পারে বলে আমার জানা নেই। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি এমন মা পৃথিবীতে একজনও নেই। একটু চিন্তা করুন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আপনার মা যদি আপনাকে কোনো শিশু নিকেতনে রেখে আসতেন, ওই মাকে কি আপনি কোনোদিনও সম্মান করতেন, ভালোবাসতেন কিংবা মেনে নিতে পারতেন? নিশ্চয়ই পারতেন না। এত ত্যাগ স্বীকার করার পরও যে মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে দ্বিধা করেন না তাকে আবার সম্মান করতেন! ভিখারি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন মা'ও হাজার ব্যস্ততা, শত কর্মের মধ্যেও সন্তানকে অন্যের কাছে দেওয়ার কথা ভাবেন না।

আমার এক মামির সন্তান হতো না। একদিন এক ভিখারিনি আসে তাদের বাড়ি। সঙ্গে দুটি শিশু সন্তান। বাচ্চা দুটি নিয়ে ভিখারিনি মায়ের নাজেহাল অবস্থা। আমার নানি তাকে প্রস্তাব দেন– এত কষ্ট না করে একটি সন্তান মামিকে দিয়ে দিতে। তিনি তাকে প্রলোভন দেখান– 'তোমার কাছে কত কষ্টে আছে, এখানে থাকলে ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা হবে। আর সম্পত্তি তো আছেই। আমার ছেলের সব সম্পত্তি ওই পাবে'। ঐ মা দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেন–

মরবে কোলে, ফেলবো জলে
তবু না দেব পরের কোলে।

কথাটা শুনে ওনার প্রতি আমার খুব রাগ হয়েছিল। খেতে দিতে

পারে না। আবার অন্যকেও দেয় না। এরা যে কী! পরে ভুল বুঝতে পেরে ঐ মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে আসে। চরণ দুটি বার বার কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এই হচ্ছেন মা...। সন্তান পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাক তার বিপদ সবার আগে বুঝতে পারেন মা। সন্তান তার খোঁজ রাখুক আর না রাখুক, সন্তানের মঙ্গল কামনায় তার কোনো কার্পণ্য নেই। মুখ দিয়ে বেরুবে না তার বিরুদ্ধে কোনো কথা। কিছুদিন আগে পত্রিকায় একটি সংবাদ পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। এক ছেলে তার বৃদ্ধা মাকে বেড়াতে যাবার নাম করে পথে ফেলে যায়। সংবাদটি পড়ে বার বার মনে হয়েছিল সত্যিই কি সে কোনো মায়ের সন্তান? চাকরিজীবী সন্তানদের এমনিতেই বাবা-মায়েরা খুব কম সময়ই কাছে পান। সারাবছর না পেলেও বছরে দু'একটা দিন (উৎসব, পার্বণে) তাদেরকে পাশে পাওয়ার প্রত্যাশা সব মায়েরই থাকে। সন্তানের আর সময় হয়ে ওঠে না মায়ের কাছে যাওয়ার। নেপোলিয়ান বলেছিলেন–

Give me a educated mother
I will give you a educated nation.

অর্থাৎ তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি উন্নত জাতি উপহার দেব। এখানে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মাকে বোঝানো হয়নি। নৈতিক শিক্ষারও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনি জানতেন সন্তানের শারীরিক, মানুষিক ও নৈতিক বিকাশে মায়ের বিকল্প নেই।

বিশ্ব মা দিবসে মায়েদের প্রতি শিশুদের শ্রদ্ধা নিবেদন

মায়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ৮ই মে'কে মার্কিন কংগ্রেসে 'মা দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়। সেই থেকে প্রতিবছর মে মাসের ২য় রবিবার দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৪৬টি দেশে দিবসটি পালিত হয়। কথিত আছে, ব্রিটেনে প্রথম মা দিবস পালনের রেওয়াজ শুরু। সেখানে মে মাসের ৪র্থ রোববার 'মাদারিং সানডে' হিসেবে পালিত হতো। তবে সতেরো শতকে মা দিবস উদ্‌যাপনের সূত্রপাত ঘটান মার্কিন সমাজকর্মী জুলিয়া ওয়ার্টসন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে মা দিবস পালন করা হয় ১৮৫৮ সালের ২রা জুন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন সর্বপ্রথম মা দিবসকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা দেন। বাণিজ্যিকভাবে দিবসটি বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম কার্ড আদান-প্রদানকারী দিবস। আমেরিকার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মা দিবসে অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি ফোন করা হয়। জুলিয়া ওয়ার্ড হোই রচিত gv`vim †W †cÖv‡K¬‡gkb (মা দিবসের ঘোষণাপত্র) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মা দিবস পালনের গোড়ার দিকের প্রচেষ্টাগুলোর অন্যতম। আমেরিকান গৃহযুদ্ধ ও ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে নৃশংসতার বিরুদ্ধে ১৮৭০ সালে এটি রচিত হয়। এটি ছিল একটি শান্তিকামী প্রতিক্রিয়া। আজ পর্যন্ত ৭ জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট 'মা দিবসের ঘোষণাপত্র' পাঠ করেছেন। আরব দেশগুলো ২১শে মার্চ মা দিবস পালন করে থাকে। ইরানে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা ফাতেমার (রা.) জন্মবার্ষিকীর দিনে এটি পালন করা হয়। ক্যাথলিক ধর্মে দিনটি বিশেষভাবে 'ভার্জিন মেরী' বা কুমারী মাতার পূজায় সমর্পিত। হিন্দু ধর্মে এটিকে বলে 'মাতা তীর্থ আনুসি'।

আমরা এত আধুনিক হয়ে গেছি যে, মা দিবসেও মায়ের কাছে না এসে দূর থেকে এসএমএস করে উইশ করি। বলি– 'মা আমি তোমাকে ভালোবাসি'। মুখের ভালোবাসা সত্যিকারের ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা অনুভবে বোঝার বিষয়। আমাদের কাছে মায়ের প্রত্যাশা খুবই কম। প্রবীণ বয়সে বাবা-মা ছোট্ট শিশুর মতো অসহায় হয়ে পড়ে। এ সময় তারা আমাদের কাছ থেকে একটু বেশি ভালোবাসা, ভালো ব্যবহার প্রত্যাশা করেন। যে মায়ের বদৌলতে আমরা পৃথিবীর আলো দেখেছি, এত বড়ো হয়েছি, তার জন্য একটু সময় বের করতে পারব না? নিশ্চয় পারব। তাই শুধু মা দিবসে নয়, বছরের প্রতিটি দিন আমরা মাকে ভালোবাসব। তাকে বোঝার চেষ্টা করব। তবেই তো আমরা নিজেদেরকে সুসন্তান বলে দাবি করতে পারব।

লেখক: প্রাবন্ধিক

এক চিলতে মাটি

জয়া সূত্রধর

ঘন সবুজ দেবদারু গাছের ছায়ায় আনুমানিক প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোকের জটলা। দেবদারু গাছকে ঘিরে নানামুখী শব্দ চয়নে অভিন্ন অভিসন্ধি পূরণে ব্যস্ত সবাই।

কালবৈশাখি ঝড়ে মুখ থুবড়ে পড়া বৃক্ষের কাছে নিজেকে লুকানোর মতো করে অবনত হয়ে আছে এক কিশোর। মায়ের স্মৃতি খেলা করে কিশোরের তপ্ত চোখজুড়ে। মা ডাকত বাবু বলে। বাবা ডাকত অজয়। মা শেষবার যেদিন রিকশায় উঠেছিল, সিটে বসিয়ে দিতেই মায়ের মুখটা এমনি সামনে ঝুঁকেছিল। দুই মামি দুই পাশে মাকে আলতো করে ধরে রেখেছিল। আধঘণ্টা পরেই মা ভ্যানে শুয়ে হাসপাতাল থেকে ময়লা চাদরে মুখচোখ ঢেকে বাড়ি চলে এসেছে। কেউ কাঁদেনি বলে সেদিনের ছোট্ট বালক অজয়ও কাঁদেনি। কিন্তু বাঁশখড়ি দিয়ে সাজানো মঞ্চে সবাই মিলে অজয়কে দিয়ে মন্ত্র পড়িয়ে আলতা-সিঁদুর রাঙানো মায়ের মুখে যখন আগুন দিইয়ে দিল তখন তার আর্তচিৎকারে ভেতরের অবুঝ বালক হৃদয়টাও বুঝি মায়ের সাথেই আত্মাহুতি দিয়েছিল।

পশ্চিমা দেশ থেকে চুলছাঁটার কাজ নিয়ে বাবা জিতু মণ্ডল এদেশে এসে মাকে বিয়ে করেছিল। সেসব কথা অজয় ঠাকুমার মুখে বহুবার শুনেছে। ঠাকুমাদের এদেশে কোনো ঠিকানা ছিল না। পরের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে থেকেছে। বাবার সাথে মাকে বিয়ে দিয়ে ঠাকুমা অনেক ঝগড়াঝাঁটি আর দেনদরবার করে মামাবাড়িতে পাকাপোক্ত থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। তবে ভিটেমাটি মামাদেরই। কারণ, হিন্দু আইনে বাবার সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনো অংশ নেই। যাহোক তবু মামাদের হৃদয় কোমল বলেই তারা ঠাকুমাদের উঠিয়ে দেয়নি বরং এ বাড়িতেই অজয় আর তার বোন অলকা জন্ম নিয়েছে।

মায়ের মৃত্যুর পরপরই শুরু হয় দিন বদলের পালা।

বাবার কাশি ভীষণরকম বেড়ে গেল। বাবা ডাক্তারের কাছে যেত না।

আট বছরের অজয় বাবার অসুখের কষ্ট বুঝত না তবু সারাদিন কায়মনোবাক্যে বাবার সুস্থতার জন্য ঈশ্বরকে ডাকত।

কিন্তু বাবাকে সুস্থ করে তুলতে পারল না। এক রাতে ঘুমের মধ্যে মনে হলো, উপর থেকে কে একজন গবগব করে জল ঢালছে শরীরে। সে জলের ধারায় ঘুমের ঘোর কেটে গেলে তন্দ্রালু চোখ নিয়ে অজয় উঠে বসে পড়ে বিছানায়। ঘরময় নিকষকালো ভুতুড়ে আবহ। ভয়ে ভয়ে অজয় ডেকে ওঠে,

বা--বা--!

অন্ধকারে উত্তর দিল ঠাকুমা,

র, বাত্তি ধরাই।

একটা কুপি হাতে নিয়ে অজয়ের সামনে আসে তার ঠাকুমা। অজয় কুপির আলোতে দেখে বুঝল, ভাঙা চালের বড়ো ছিদ্র দিয়ে অঝোরে বৃষ্টির জল পড়ছে বিছানায়। ঠাকুমা তাড়াতাড়ি একটা গামলা বসিয়ে দিল সেখানে।

পাশের অন্য একটা বাঁশের মাচার ওপর বোন অলকা হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে। অলকার পায়ে মায়ের দেওয়া কালচে হয়ে যাওয়া রুপার পায়েল। ডান পায়ের পায়েলটি কিছু উপরে এসে মাংসল জায়গায় আটকে গেছে। তেল ফুরিয়ে আসা কুপির টিমটিমে আলোয় অজয়ের কাছে বোনটিকে গল্পে শোনা রাজকন্যার মতো মনে হয়।

ঘুমঘুম চোখে চারদিক ভালো করে দেখে অজয় কিন্তু ঘরের কোথাও বাবাকে দেখতে পায় না। অবশ্য বাবার দেখা সে পেয়েছিল, সাত দিন পর। শেষবারের মতো বাবার কালো চুলে হাত বুলিয়ে লম্বাটে মুখের ওপর পরে পরে কেঁদেছে। মা চলে যাবার পর থেকে কাউকে মায়ের মতো আপন মনে হয়নি, বাবার মতোও কেউ হবে না আর। এটা বুঝতে পেরেছিল অজয়। তাই মা হারানোর বেদনা বাবাকে বিদায় দেবার কষ্টের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে দুচোখে প্লাবন হয়ে নেমেছিল। সবার মুখে শুনেছে বাবার নাকি যক্ষ্মা হয়েছিল কিন্তু সঠিক সময়ে চিকিৎসা হয়নি।

এতিম ভাইবোনের দায়িত্ব মামাদের হাতে বুঝিয়ে দিতে দুই পিসি আর একমাত্র কাকা ছুটে আসে। বেশ কিছু দিন অজয়দের ঘরে থেকে নিজেদের খরচে খেয়ে দিনরাত ঝগড়া করেও পিসিদের পক্ষ মামাদের পক্ষের সাথে কোনো সমাধানে আসতে পারেনি। ছোটো মামা বিমল বাড়িতে দিনরাত পাহারা দিতে লাগল যেন তার অনুপস্থিতিতে অজয় আর অলকাকে ওরা রেখে যেতে না পারে।

খাওয়া, ঘুম উঠে গেল। বিরামহীন ঝগড়া আর ঝগড়া। অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে গ্রামের কয়েকজন হিতার্থী এগিয়ে আসেন মধ্যস্থতা করতে। দরবারে মামারা বললেন,

আইনে আমরা ঠেকা নই। আমগোর বাপ-দাদার সম্পত্তিতে আমগোর বইনের কুনো ভাগ নাই। তারপরেও বইন বিয়া দিয়া নিজেরা জায়গা ছাইড়া দিছি। অহন বইন, বইন জামাই মইর‍্যা গেছে। অহন আর থাকবার দিবার পারুম না। ওগোর বংশের পোলা-মাইয়া ওরা নিয়্যা যাক।

অজয়ের বড়ো পিসি হাত নাচিয়ে শরীর দুলিয়ে মুখ ভেংচি কেটে বলতে শুরু করল,

অ রে ওই বিমল, আমার রাজপুত্রের মতো ভাইরে ধইরা রাইখ্যা তর কালি কুদলে বইনরে ভাইয়ের গলায় ঝুলাইয়া দিছিলি। অহন উডাইয়া দিবি ক্যা? এক চিলতে মাডিই তো! অজয় ক্যা, অজয়ের চৌদ্দগুষ্ঠী এই ভিটায়ই থাকব, হু।

দরবারে কোনো পক্ষের কথাই ধোপে টিকল না। স্থানীয় গণ্যমান্যরা রায় দিল,

অজয় তার ছোটো মামা বিমল শর্মার কাছেই থাকবে। কারণ বিমল আর্থিকভাবে সচ্ছল। আর পাঁচ বছরের অলকা থাকবে পিসিদের কাছে। পিসিদের মধ্যে সবিতা নাট্য ও যাত্রাশিল্পী। অলকা বড়ো হলে তার বিয়ে দেওয়ার খরচ বহন করতে চাইল সে। কাকার কথা হলো, সে মাকে খাওয়াচ্ছে তাছাড়া ছেলেপুলে নিয়ে সংসারও কম ভারী নয়।

শেষ পর্যন্ত বড়ো পিসি অনিতা তার টানাটানির সংসারে অলকাকে নিয়ে পরদিন সকালে রওয়ানা হওয়ার কথা সবাইকে জানিয়ে দিল। বৈঠক ভাঙার মুহূর্তে সে আরও একটা দাবি করল, ওই ঘর, ওই মাটিটুকু যেন কেউ দখল না করে নেয়। অজয় বড়ো হলে বউ নিয়ে বাবার ঘরেই যেন থাকতে পারে।

বোনকে দেখে না অজয় চার-পাঁচ বছর ধরে। পিসি মাঝেমাঝে আসে কিন্তু অলকাকে নিয়ে আসে না। পিসি দু-একদিন করে অজয়দের ঘরে থাকে। ঘরদোর পরিষ্কার করে, বাজার-সদাই করে অজয়কে খাওয়ায় তারপর আবার হাঁড়িপাতিল মেজেঘষে পরিষ্কার করে তা যত্ন করে তুলে রেখে চলে যায়। পিসি চলে গেলেই অজয়ের ক্ষুধা যেন বেড়ে যায়। পেট ভরে খেতে ইচ্ছে করে দিনে তিন- চারবার বা যতবার মন চায়। কিন্তু পাবে কই?

সকাল, দুপুর, রাতে খাবারের সময় মামা প্রতিবেশীদের শুনিয়ে বেশ তোড়জোড় করে অজয়কে ডাকেন খাবারের জন্য। প্লেটের কোনায় এক চামিচ ভাত আর একটু ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়া সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেন মামা। মাছ ছাড়া মাছের ঝোলে ভাত মাখিয়ে মুখে দিতেই অজয়ের পেট গুলিয়ে ওঠে। একটু মাছ খাওয়ার জন্য মনটা আইঢাই করতে থাকে। কিন্তু পাওয়ার উপায় নেই।

অজয়ের পেটের ক্ষুধা নীরব বিদ্রোহ করে চলে। মামার মতো গলা ফাটিয়ে সবাইকে জানান দিতে পারে না। এ শুধুই অজয়কে তাড়া করে ফিরে। নির্বোধ ক্ষুধার ইঙ্গিতে চাতুর্যপূর্ণ আচরণ দিয়ে গৃহ

মালিকদের ভুলিয়ে তাদের রান্নাঘরে ঢুকে যাওয়া এখন আর তার কাছে কঠিন কাজ নয়।

মানুষদের বোকা বানানোর সেসব কৌশলের কথা মনে করে অজয়ের মার খাওয়া বিদগ্ধ মুখেও হাসির চিরল রেখা ফুটে ওঠে।

এখন সবাই অজয়কে পাগলা বলে ডাকে।

চোখের জলে পিসি বংশের কালিমা ধুয়ে বিদায় নিয়েছে অজয়ের কাছ থেকে।

পিসি আর আসবে না। অজয়ের এখন আর কেউ নেই। গ্রামের মানুষ ওকে মেরে ফেলবে।

কী করলে ভালো হয় সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না অজয়। কোনো দিন এই গ্রামের বাইরে সে যায়নি তবুও আজ কার অদৃশ্য নির্দেশে গুটিগুটি পায়ে হেঁটে স্টেশনে এসে পৌঁছালো। বিকেল গড়িয়ে রাত হয়ে যায়। প্লাটফর্মের এককোনায় ছিন্নমূল মানুষের সাথে অজয়ও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের মধ্যে অনেক বছর পর অজয় স্বপ্ন দেখল। বোন অলকা পায়েল পরে এগিয়ে আসছে তারই দিকে। দাদা, দাদা বলে ডাকছে অলকা।

ঘুম ভেঙে যায় অজয়ের। কেমন আছে অলকা? বড়ো হয়ে দেখতে কেমন হয়েছে এখন? সেও কী অজয়ের মতোই নিভৃত কষ্টের বাসিন্দা? ভেবে ভেবে বোনটার জন্য কষ্টে বুক ফেটে যেতে চাইছে। এমন সময় একটি ট্রেনে ইঞ্জিন লাগল। প্লাটফর্মের কিছু লোক হুড়োহুড়ি করে ট্রেনে উঠতে লাগল।

অজয়ও তাদের পেছনে পেছনে একটি কামরায় উঠে একটা সিটের নিচে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল।

বাতাসে ভর করে সময় বয়ে যায়। ধীরে ধীরে গ্রামের মানুষের সকল গুঞ্জন, সন্দেহ, অপবাদের অবসান ঘটতে থাকে। অজয় ফিরে আসে না। দীর্ঘ সাত বছরে গ্রামের কেউ কোনো দিন কোথাও তার দেখা পায়নি। অলকার বিয়ে হয়ে গেছে। বর নিয়ে সে পিসিদের সাথে মামাবাড়ি বেড়াতে এসেছে। অলকার বর মামা-মামিসহ বাড়ির সকলের জন্য প্রচুর উপহার কিনে নিয়ে এসেছে। প্রচুর খরচাপাতি করে সবাইকে নিয়ে খাওয়াদাওয়া করছে। অতীতের তিক্ত সম্পর্ক ভুলে মহা আনন্দযজ্ঞে মেতে উঠেছে দুই পরিবার। অলকা সবিতা পিসির কাছ থেকে নাচ-গান-অভিনয় রপ্ত করে নিয়েছে। রাতের খাওয়া শেষে মামাতো, পিসতুতো ভাইবোনেরা মিলে বিনোদনের জমজমাট আসর বসায়। দীর্ঘ এক যুগ আগের ছোট্ট অলকা আজ এসে স্মৃতিচারণ করে আবার ছোট্টটি হয়ে যায় না বরং ছোটোবেলায় এখানে কাটানো সময়ের প্রায় সবকিছুই ভুলে গেছে সে। মা-বাবার আবছা ছবি কখনো চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে পরক্ষণেই তা মিলিয়ে যায়। পিসি এক টুকরো ভিটে দেখিয়ে বলেছে, এইখানে নাকি তার মা-বাবা অজয় আর তাকে নিয়ে থাকত যদিও অলকার মনে নেই আজ। শুধু দাদার মুখের ছবিটা আজো একেবারে অস্পষ্ট হয়ে যায়নি অলকার কাছে। দাদার কোলে বসে কী একটা গাছে বানানো দোলনায় দোল খেত সে। দাদা তাকে শক্ত করে ধরে জোরে দোল দিত। সামনে-পেছনে যত বেশি দোল লাগত তত বেশি অলকার খুশি লাগত। আনন্দে দাদার কোলে বসে হাততালি দিত আবার কোনো কোনো সময় ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি মুখে নিয়ে চুষতে থাকত। এসব ঠিক মনে পড়ে অলকার। আজ দাদা থাকলে কত আনন্দই যে লাগত! এত হাসিখুশি, এত সুখের মাঝে অলকা বুকে লুকিয়ে থাকা কষ্টের এক পাথরে ধাক্কা খায় বারবার, অসংখ্যবার। পাড়ায় সকলের কাছে অলকা অজয়ের খোঁজ জানতে চায় কিন্তু কেউ অজয় সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না। বুকের পাথরের আঘাতে চোখ ফেটে অশ্রু ঝরে পরে অলকার। তার স্বামী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করে রাখে।

দশ দিনের মাথায় মামাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অলকা পিসিদের সাথে রওনা হলো স্বামীগৃহের উদ্দেশে। তারা একটি ভাড়া মাইক্রোবাসে উঠতে যাবে, এমন সময় মামাতো ভাই জীবন অলকাকে ডেকে নিল আড়ালে। অলকার হাত ধরে চোখ মুছতে মুছতে বলল,

বোন, তোর কাছে আমি কথা গোপন করেছি।

অলকা যেন শূন্য থেকে পড়ল। ব্যতিব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল,

কী, দাদা?

জীবন বলল,

আমি কেমন করে বলি, বল। একথা জানলে তুই সারাজীবন চোখের জলে ভাসবি। আবার না বললেও যে আমি ওপরওয়ালার কাছে দায়ী থাকব।

অলকা বুঝতে পারে, নিশ্চয়ই অজয়ের কোনো খবর। কেননা এ কয়দিন সে শুধু অজয়ের কথাই জানতে চেয়েছে। মনকে শক্ত করে জীবনের হাতে বড়ো ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,

দাদা, বলো।

জীবন বলতে লাগল, গত বছর আশ্বিন মাসে আমি ঢাকার মিরপুরে হঠাৎ করে অজয়ের দেখা পেয়ে যাই। ও মাজার রোডের মোড়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমটায় আমি চিনতে পারি নাই। ময়লা জামাকাপড় পড়া, লম্বা চুল। তাছাড়া কয় বছরে ও অনেক জোয়ান হয়ে গেছে।

ওর পাশ দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। ও পাশের একজনকে উদ্দেশ করে বলছিল,

আমগোর বখশিগঞ্জ যাইস, তরে সাইজ কইর‍্যা দিব।

আমি অবাক হয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি সে পাশের ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসছে।

তার হাসি, চোখ, নাক, ঠোঁটের ভাঁজ দেখে আর আমার সন্দেহ রইল না যে, এ আমাদেরই অজয়।

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে বোধ হয় আমাকে চিনতে পেরেছিল। আমার কাছ থেকে বিদ্যুৎবেগে সরে যাচ্ছিল সে। আমি পেছন থেকে ডাকলাম,

অ-জ-য়

অজয়...

আমার ডাক শুনে সে পড়িমরি করে দৌড় দিয়ে রাস্তা ক্রস করে পালাতে চেয়েছিল।

অলকা শুনছে। হিম হয়ে আসছে তার সমস্ত শরীর।

জীবন বলেই চলেছে,

বোন রে, প্রথমটায় পালাইতে সে পারে নাই, আমি পেছন থেকে অনেক কষ্টে তাকে ধরে ফেলি। কিন্তু কোনোভাবেই তাকে মানাতে পারি নাই। সে আমার কাছে ধরা দিতে দিতে আবার মুক্ত হয়ে গেল। আমাকে বলল, আমি আর ফিরে যাবো না আর কোনোদিন আমাকে ডাকবি না বলেই চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।...

হু হু করে কেঁদেই চলেছে জীবন। তার কান্না দেখে গাড়ি থেকে নেমে এসেছে সবাই। জড়ো হয়েছে গ্রামবাসীরাও।

অলকা নিঃশব্দে হাত ছাড়িয়ে গাড়িতে উঠে বসে। যেন এই হবার ছিল, এটাই যেন নিয়তি। স্বামীর হাতে হাত রেখে শীতল কণ্ঠে বলে উঠল,

ভালোই হলো। গোধূলির আলোছায়ার লুকোচুরি রাতের অন্ধকারে সাঙ্গ হয়েছে।

প্রকৃতির রূপে

আব্দুল আউয়াল রণী

তোমায় দেখেছি
নয়নের গভীরতায়।
অনন্য সুন্দরী
একক রূপের গতিময়।
যে রূপের পৃথিবীতে
সৃষ্টিত্বের অনন্য রূপ।
সে রূপের পৃথিবীতে
ফুসেছে তোমার রূপ;
তোমার রূপ তত্ত্বের বর্ণনায়
ফাগুনের রূপের বৈচিত্র্য গুনগুনায়।
দিগন্ত ফসলের মাঠ আর বৃক্ষ লতায়
বাতাসের সুরেলা ধ্বনিতে চিত্র ফুটায়।
চৈতীর রূপের ককর্শতায়
তোমার পৃথিবীর আলোচ্য বিষয়।
তমাল তাণ্ডব ঝাউলতা
মনে হয় বুঝি লজ্জায় মুখ লুকায়।
অপরূপ রূপের সাদার সৈকত
সুরেলা নিত্যের আসরে।
তোমায় লয়ে বুঝি বা আয়োজন
নিমন্ত্রিত অতিথি উল্লাসে মাতে অথরে।
বৈশাখ এসেছে লয়ে,
বৈচিত্র্য রূপের মহিমা।
ঝড়ের তাণ্ডবলীলা সাজায়ে,
বৈরীতা চিত্রের কত আলপনা।
পাহাড়ের পাহাড়ি বৈচিত্র্যতা,
রূপের কোষে কোষে অমৃততা।
আদিবাসী নিত্যের তারুণ্যে,
বাজে সুরের লহরতা।
সেখানে তো দেখেছি
আদিবাসী রূপ সাজনে।
নূপুর পায়ে নিত্যের রঙ্গোল্লাসে
মাত করেছ সেই আসর সঙ্গীতায়নে।

বৈশাখি কেয়া

জানির আহম্মেদ

এই বাংলার আকাশে রংধনু বিকাশে
কত রোদ-বৃষ্টি আর আলোর খেয়া,
তাই বাংলার মাটিতে সবুজ বনানীতে
পল্লি মায়ের বুকে জন্মে কেয়া।
ফাল্গুনে আর চৈত্রে লাল-সবুজ বৈচিত্র্যে
নতুন রূপে সাজে ঐ উদ্ভিদকুল,
ষড়ঋতুর দ্রাবে পাখির কলরবে
মৌবনে ফোটে কত কেয়াফুল।
সবুজের আঙিনায় কেয়াফুল শোভা পায়
পল্লিবালার ভাষ্য থেকে নেওয়া।
এই বাংলার কেয়াফুল রূপে-ঘ্রাণে অতুল
বাঙালির হৃদয় সাজায় অসীম,
লাল-সবুজের সারি গ্রাম-গঞ্জ-নগরী
আত্মার আত্মীয় হৃদয় সসীম।
বৈশাখি আর জ্যৈষ্ঠী আম-জাম-কাঁঠাল-মিষ্টি
বয়ে আনে শুভ নববর্ষ,
বাঙালি ঐতিহ্য হালখাতায় বাণিজ্য
রূপের মৌবনে কেয়া আদর্শ।
রূপের এই জীবনী কেয়া বিবরণী
এই রূপসী বাংলা থেকে নেওয়া।

অপরাজিতা

মুহাম্মদ ইসমাঈল

তোমার হরিণী চোখযুগল অপরূপ
সোনালি গ্রীবা রূপের আলো
লাল ঠোঁট কেনো যে এতোই ভালোলাগে।
হৃদয় গভীরে তোলে উথালপাতাল ঝড়
তোমার হাসি যেন মোনালিসার মতো
শরীরের প্রতিটি লোমকূপে ফেঁসে উঠে রোদ
বিন্দু বিসর্গ কিছুই অনুভব করতে পারছি না
তুমি কি এখনো অবুঝ খুকি?
পৃথিবীটা এখন সেকেলে নেই
ডিজিটাল হয়ে গ্যাছে সেই কবে
দেখোনি তোমার চারপাশের প্রযুক্তি
প্রকৃতির মূল্য মোটেও বুঝ না?
পাখির গান কি হৃদয়ে তোলে না শিহরণ একবারো?
আসল-নকল বুঝার সময় নেই তোমার
তোমার লাবণ্যময় দেহের ভাঁজে কি
প্রেম প্রেম খেলতে ইচ্ছে করে না?
প্রেমানুভূতির আলোড়ন উঠে না মোটেও
তোমার জন্য এ দেহ মনপ্রাণ
আমি জানি তুমি স্বল্প শিক্ষিতা এক নারী
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আয় রোজগার কর
তুমি তো অনেক দামি এক মেয়ে
তোমার মধ্যে সরলতা বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে
খাম খেয়ালিপনা নেই।
বিষয়-সম্পত্তি, ক্লান্তি-অবসাদ, জয়-পরাজয়
সব কিছু সারাক্ষণ নিবেদিত
ডুবে যেতে পারি সমুদ্রের অগাধ গহীনে।

শেকড় সন্ধান

আয়েশা ছিদ্দিকা

কত শত হাজার বছর বাংলা-বাঙালি, মা-মাটি
চিহ্ন এঁকেছে দিয়ে গেছে প্রাণ
কত হাজার জন মিলে করেছে শেকড়ের সন্ধান
পিতা-প্রপিতামহ ভিটামাটি ছুয়ে এঁকেছে পতাকা
এদেশের মাটিতে শোষণ করেছে
আফগান, চেঙ্গিস, তুর্কি, মুঘল, ইংরেজ, বেনিয়া
পলাতক দস্যু করে গেছে শোষণ এ মাটি মানুষের হৃদয় চিরে
টুপটাপ শিশিরের মতো কান্না ঝরেছে বাঙালির হৃদয়
জুয়াড়িরা খেলেছে জুয়া প্রাণ দিয়েছে লাখো জনতা
স্বজনের ধূসর স্মৃতি মেলে ধরে পাণ্ডুলিপি এমনি জন জন্মেছিলেন যিনি
স্বপ্নদ্রষ্টা মানবতার মুক্তির আরাধনায় তিনি
নিজেকে বিলিয়ে অতন্দ্রপ্রহরী, নিদ্রাহীন আয়েশবিহীন জীবন
জীবন-মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়েছেন
বাংলার মানুষের দ্বারে।
এদেশ হবে স্বাধীন
অদম্য ইচ্ছাশক্তি প্রতিরোধ্য জ্ঞানভাণ্ডার
অন্ধ জনপদে চৈতন্যের জ্ঞান ছড়িয়ে।
জলন্ত দাবা অগ্নিগিরির মতো
নোঙর ফেলেছিলেন অশান্ত ঢেউয়ের ওপর
জনস্রোতের প্লাবনের উপর দাঁড়িয়ে
বলেছিলেন সেই অমর বাণী–
আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি...
তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।
সৃষ্টিশীল সেই উন্মাদনা উদ্যমীয় বাণী
প্রত্যাশাই এদেশ এ জাতি এ মাটি
মহাসাগরের মতো বিশাল প্রাণ
বিশাল হৃদয় তাঁর, আমাদের জাতির পিতার
তাই তো তিনি সারাবিশ্বের মহানায়ক
মহান স্বাধীনতার সৃষ্টির জনক
স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতির কবি।

২৯শে মে: আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস

বিশ্বজুড়ে সুনাম বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের

আফিয়া খাতুন

প্রতিবছর ২৯শে মে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস পালিত হয়। এদিনে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকল নারী-পুরুষকে, যারা শান্তিরক্ষার লক্ষ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পেশাদারি মনোভাব বজায় রেখে কর্তব্যপরায়ণতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বপালন করেছেন, তাঁদের আত্মত্যাগের ঘটনাকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও যথোচিত সম্মানপূর্বক স্মরণ করা হয়। ২০০৩ সাল থেকে এ দিবসটি পালন শুরু হয়।

২০০৯ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় নারীদের অবদান ও ভূমিকার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। শান্তিরক্ষায় নারীর ভূমিকা ও লিঙ্গ-বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

এ দিবসকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দফতরে দ্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক বিতরণ করা হয়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও জাতিসংঘের মহাসচিব সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষীবাহিনীকে অভিনন্দন বার্তা প্রদান এবং তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার কথা তুলে ধরে বক্তব্য দেন।

এছাড়াও, বিশ্বের সর্বত্র আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস পালন করা হয়। শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোয় তাদের নিজস্ব শান্তিরক্ষীদের বহির্বিশ্বে শান্তিরক্ষার ভূমিকাকে স্মরণ করে সম্মানিত করা হয়। ঐ দেশগুলোতে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীগণ দিবসটি পালনে, সভা-সমাবেশ, প্রদর্শনী ইত্যাদি স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয়োজন করে থাকেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে মোতায়েনের জন্য জাতিসংঘের নিয়মিত কোনো সৈন্য বা পুলিশবাহিনী নেই। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রয়োজনে তারা নিজস্ব বাহিনী দিয়ে জাতিসংঘকে সহায়তা করে। প্রথমদিকে ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি বড়ো দেশসমূহ সৈন্য ও লোকবল দিয়ে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে সচল রাখত। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ও সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর উন্নত দেশসমূহ সৈন্য সরবরাহ করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এ অবস্থায়, এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশসমূহ এগিয়ে আসে। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালই জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী কার্যক্রমে সিংহভাগ সদস্য সরবরাহ করে।

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ১৯৮৮ সালে UNIMO (United Nations Iran-Iraq Military Observers Group)-এ ১৫ জন সেনা সদস্য প্রেরণের মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সদস্য প্রেরণ আরম্ভ করে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বর্তমানে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী এবং বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীর সর্বমোট ৭০৮০ জন (সেনাবাহিনী-৫৪৫৬ জন, নৌবাহিনী-৩৪০ জন, বিমানবাহিনী-৫০১ জন এবং পুলিশবাহিনী ৭৮৩ জন) শান্তিরক্ষী মোতায়েন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর ৬২ জন নারী শান্তিরক্ষী কর্মকর্তা বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েন রয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর ১,৫৬,১৮৪ জন সদস্য শান্তিরক্ষা মিশন সম্পন্ন করেছেন এবং এর মধ্যে ৩০৭ জন নারী কর্মকর্তা এবং ১৮০৯৯ জন পুলিশবাহিনীর সদস্য।

একনজরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশের সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশবাহিনীর সদস্য সংখ্যা (৩১শে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত) নিম্নরূপ:

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এ পর্যন্ত সর্বমোট মিশন সম্পন্নকারী সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশবাহিনীর সদস্য

ক্রমিক	সেনাবাহিনী	নৌবাহিনী	বিমানবাহিনী	মোট	পুলিশবাহিনী	সর্বমোট
১	১২৬৮৭৬	৫০৮৫	৬১২৪	১৩৮০৮৫	১৮০৯৯	১৫৬১৮৪

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বর্তমানে কর্মরত সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশবাহিনীর সদস্য

ক্রমিক	সেনাবাহিনী	নৌবাহিনী	বিমানবাহিনী	মোট	পুলিশবাহিনী	সর্বমোট
১	৫৪৫৬	৩৪০	৫০১	৬২৯৭	৭৮৩	৭০৮০

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিভিন্ন দেশে বর্তমানে কর্মরত সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশবাহিনীর সদস্য

ক্রমিক	দেশ	মিশন	সেনা	নৌ	বিমান	মোট	পুলিশ	সর্বমোট
১	ডি আর কঙ্গো	মোনুস্কো	১৩৫৫	১০	৩৭৪	১৭৩৯	১৭৮	১৯১৭
২	লেবানন	ইউনিফিল	০	১১৫	০১	১১৬	০	১১৬
৩	দক্ষিণ সুদান	আনমিস	১৩৮৯	২০১	০৩	১৫৯৩	১৯	১৬১২
৪	সুদান (দারফুর)	ইউনামিড	৩৬৩	০১	০৫	৩৬৯	১৫৭	৫২৬
৫	পশ্চিম সাহারা	মিনারসো	২৩	০২	০৩	২৮	০	২৮
৬	মালি	মিনুসমা	১২৭৭	০৪	১১২	১৩৯৩	২৭৯	১৬৭২
৭	আফ্রিকান রিপাবলিক	মিনুস্কা	১০৪০	০৬	০৩	১০৪৯	০	১০৪৯
৮	হাইতি	মিনুস্হা	০০	০	০	০	১৪৮	১৪৮
৯	ইউএসএ (নিউইয়র্ক)	ইউএন হেডকোয়ার্টার	০৬	০১	০	৭	০১	৮
১০	সাইপ্রাস	ইউনিচিফ	০৩	০	০	৩	০	৩
১১	লাইবেরিয়া	আনমিল	০	০	০	০	০১	০১
		সর্বমোট	৫৪৫৬	৩৪০	৫০১	৬২৯৭	৭৮৩	৭০৮০

বাংলাদেশে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণ বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা উজ্জ্বল করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন তা নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করছে। উত্তর মালির তাবান কোর্টে জাতিগত সংঘর্ষের যে সূত্রপাত হয়েছিল তা দমন এবং সমাধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের পদচিহ্ন পূর্ব তিমুর থেকে হাইতি এবং ক্রোয়েশিয়া থেকে নামিবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। শান্তিরক্ষীরা ইউরোপীয় শীতপ্রধান দেশ থেকে শুরু করে পূর্ব এশিয়ার গ্রাম, বৈরীভাবাপন্ন আবহাওয়া এবং সাহারার মরুভূমিতেও সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। এছাড়া লাইবেরিয়া মিশনে নিয়োজিত সদস্যগণ সেদেশের ভোটার আইডি কার্ডসহ সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদনে অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছে এবং সেদেশের জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। মোতায়েনরত দেশসমূহে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মূল দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিভিন্ন মিশনে মাইন নিষ্ক্রিয়করণ, সড়ক যোগাযোগ স্থাপন, চিকিৎসা সহায়তা এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ফলে বর্তমানে জাতিসংঘ কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী Troops Contributing দেশ হিসেবে ৪র্থ স্থান অর্জন করেছে। বাংলাদেশ সেনাসদস্য কর্তৃক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এলাকায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হয়ে থাকে:

(ক) আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম দমন;

(খ) জাতিগত দাঙ্গা নিরসন ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমে সাধারণ জনগণকে প্রেষণা প্রদান;

(গ) গরিব ও দুস্থ জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান এবং ওষুধ সরবরাহ;

(ঘ) জাতি গঠন (Nation building)-এর অংশ হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

(ঙ) শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবে কম্বোডিয়া, মোজাম্বিক, সিয়েরা লিয়ন, সুদান, আইভরিকোস্ট এবং লাইবেরিয়া উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে সিয়েরা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের একটি নারী কন্টিনজেন্ট

লিয়ন বাংলা ভাষাকে তাদের একটি অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়াও, গত ১৪ থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় সেনাকমান্ড এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যৌথ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্যাসিফিক আর্মি ম্যানেজমেন্ট সেমিনার-৩৮ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে ৩১টি দেশের ১৫০ জন সেনা কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সর্বপ্রথম যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৩ সালে United Nations Operation in Mozambique (UNMOZ)-এ মিলিটারি অবজারভার প্রেরণের মাধ্যমে। এখন পর্যন্ড় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নৌবাহিনী থেকে সর্বমোট ৩০টি শান্তিরক্ষা মিশনে ৫০৮৫ জন কর্মকর্তা ও নাবিক অত্যন্ত দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সুনামের সাথে দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে শান্তিরক্ষা মিশনের ৮টি দেশে নৌবাহিনীর সর্বমোট ৩৪০ জন নৌসদস্য নিয়োজিত রয়েছে।

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL): ভূমধ্যসাগরে দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় Maritime Interdiction Operation-এর অংশ হিসেবে টাস্কফোর্সের অধীনে বানৌজা আলী হায়দার সর্বমোট ১৩৭৮টি জাহাজকে সফলভাবে Hail (শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাথমিক তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ) করে যা ইউনিফিল মিশনের মেরিটাইম টাস্কফোর্সে অংশগ্রহণকৃত জাহাজসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। বর্তমানে নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধ জাহাজ বানৌজা বিজয় ১১০ জন জনবল এবং ১২টি এলপিসি'র সমন্বয়ে একটি ফোর্স মেরিন ইউনিটসহ ইউনিফিল লেবাননে মোতায়েন রয়েছে।

United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS): জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন UNMISS (দক্ষিণ সুদান)-এ মোতায়েনকৃত কন্টিনজেন্ট অত্যন্ত সফলভাবে জাতিসংঘের Mandate বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। BANFMU কর্তৃক White Nile River-এ এক বছরে ১১টি অপারেশন লাইফলাইন সফলভাবে শেষ হয়। এ কন্টিনজেন্ট কর্তৃক প্রায়ই ডুবুরি ও নৌ-কমান্ডোদের সহায়তায় উদ্ধার কার্যক্রম চালানো হয়। বিভিন্ন সময়ে কন্টিনজেন্ট কর্তৃক UNICEF-এর নিরাপত্তাকর্মী, World food programme-এ নিয়োজিত কর্মীগণকে ও স্থানীয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিপন্ন জনগণকে উদ্ধার ও আশ্রয় প্রদান করা হয়।

২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্টসমূহ থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েন বাবদ প্রায় ১১৫৯ কোটি টাকা (এক হাজার একশত উনষাট কোটি টাকা) মাত্র বাংলাদেশ সরকারের কোষাগারে জমা হয়েছে এবং বর্তমানে মোতায়েন বাবদ প্রতিবছর প্রায় ১৬১ কোটি টাকা হারে সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার বাস্ড়বায়নে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী জাতিসংঘ শান্ড়িরক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সদস্যগণ শান্ড়িরক্ষা মিশনে অত্যন্ড় সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে এবং আন্ড়র্জাতিক অঙ্গনে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী বাংলাদেশের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখছে। Civil Military Cooperation (CIMIC)-এর আওতায় জাতিসংঘ শান্ড়িরক্ষা মিশনে নিয়োজিত সদস্যগণ ওষুধ বিতরণ, লেখাপড়ার সামগ্রীসহ নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীও বিতরণ করে থাকে। পাশাপাশি স্টাফ অফিসার এবং মিলিটারি অবজারভার হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন নাগরিকদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রদর্শনপূর্বক UN কর্তৃক নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পাদন করছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতিসংঘ শান্ড়িরক্ষীদের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে কন্টিনজেন্টসমূহের সাথে মানুষ্যবিহীন বিমান (UAV) এবং মাইন রেজিস্ট্যান্ট অ্যাম্বুশ প্রোটেকটেড ভেহিক্যাল (MARP) সংযোজিত হতে যাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ১২টি Mi-17/Mi-171/Mi-171SH হেলিকপ্টার (৬টি কঙ্গোতে, ৩টি হাইতিতে এবং ৩টি মালিতে) এবং ১টি সি-১৩০বি পরিবহণ বিমান শান্ড়িরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জাতিসংঘ শান্ড়িরক্ষা মিশনসমূহে বিমানবাহিনীর সদস্যদের অনুকূলে উড্ডয়ন এবং সরঞ্জামাদি বাবদ সর্বমোট ৪৬,৯৬,১২,০০০/- (ছেচল্লিশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ বারো হাজার টাকা) সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

পুলিশবাহিনী

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের প্রথম অবস্থায় যুদ্ধবিধ্বস্ড় দেশসমূহে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে সম্পাদিত শান্ড়িচুক্তি বাস্ড়বায়ন পর্যবেক্ষণ, নিরস্ত্রীকরণ ও প্রতিবেদন প্রদান কাজে কেবল সেনাবাহিনীর সৈন্য ও অফিসারদের মোতায়েন করা হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে শান্ড়িরক্ষা কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেলে সেনা সদস্যদের পাশাপাশি পুলিশ অফিসারসহ অন্যান্য বেসামরিক বিশেষজ্ঞদেরও মোতায়েন করা হয়।

১৯৬৪ সালে জাতিসংঘের সাইপ্রাস মিশনে সর্বপ্রথম পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়। কিন্তু সেই সময় পুলিশবাহিনীর কার্যক্রম আজকের মতো এত ব্যাপক ছিল না। সত্তর ও আশির দশকে স্নায়ুযুদ্ধের ডামাডোল শান্ড়িরক্ষার কাজে বেশ ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়। এই সময় শান্ড়িরক্ষার কাজে পুলিশ সদস্যদের মোতায়েনও অত্যন্ড় সীমিত আকারে চলে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নামিবিয়া মিশন থেকে জাতিসংঘের শান্ড়িরক্ষা মিশনে পুলিশবাহিনীর ব্যাপক অংশগ্রহণ শুরু হয়।

বাংলাদেশ পুলিশ ১৯৮৯ সালে আফ্রিকার নামিবিয়া শান্ড়িরক্ষা মিশনে প্রথম অংশগ্রহণ করে। এ পর্যন্ত ১৮০৯৯ জন পুলিশ সদস্য জাতিসংঘ শান্ড়িরক্ষা মিশন সম্পন্ন করে এসেছে। বর্তমানে ৭৮৩ জন সদস্য কর্মরত আছে।

লেখক: যুগ্মসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিলেন মোঃ আবদুল হামিদ

দেশের ২১তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ গ্রহণ করলেন মোঃ আবদুল হামিদ। ২৪শে এপ্রিল ২০১৮ বঙ্গভবনের দরবার হলে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ নেওয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মোঃ আবদুল হামিদ রাষ্ট্রপতি পদে সপ্তদশ ব্যক্তি হিসেবে ২১তম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সংবিধান অনুযায়ী একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। আগামী পাঁচ বছর তিনি এ পদে বহাল থাকবেন। সেইসাথে তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র ব্যক্তি যিনি টানা দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালন করবেন।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য বিচারপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, সিনিয়র রাজনীতিক এবং কূটনীতিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, গত ৭ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান মোঃ আবদুল হামিদকে নির্বাচন কমিশন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় ২১তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণা করে। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এর আগে ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল প্রথমবারের মতো দেশের ২০তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প পরিদর্শনে রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২রা এপ্রিল মুন্সীগঞ্জ ও শরীয়তপুরের পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি সেতু নির্মাণের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। দুই দিনের এ সফরে রাষ্ট্রপতি সিনো হাইড্রো মাঝিকান্দি, মাওয়া থেকে কাঁঠালবাড়ী, জাজিরা পয়েন্টে পদ্মা সেতু স্প্যান ও সেতু নির্মাণসহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সেতু নির্মাণ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতিকে সেতুর নির্মাণ কাজ ৫৩ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে বলে অবহিত করেন।

সৃজনশীলতার দ্বার উন্মোচনের আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৪ঠা এপ্রিল খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির বক্তৃতায় তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষা ও সনদ প্রদানই মূল উদ্দেশ্য নয় বরং মেধাবিকাশ, উন্মুক্ত চিন্তা-চেতনার উন্মেষ, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা প্রয়োগের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হলো বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, গবেষণা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে যাতে শিক্ষার্থীরা সম্পৃক্ত হতে পারে তার দ্বার উন্মোচন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি।

চিকিৎসকদের দায়বদ্ধতা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, চিকিৎসকেরা জাতির মূল্যবান সম্পদ। চিকিৎসক গড়ে তোলার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভূত অবদান রয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি চিকিৎসকদের দায়বদ্ধতা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। গত ৩১শে মার্চ অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিশিয়ানস অব বাংলাদেশের (এপিবি) ২৯তম বার্ষিক সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক সেমিনার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, রোগীরা হাসপাতালে অতিথি। তারা যেন হাসপাতালে কষ্ট না পায় সে ব্যাপারে চিকিৎসকদের বিশেষ নজর দিতে হবে। এছাড়া বিনা প্রয়োজনে রোগীদের ব্যবস্থাপত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা উল্লেখ না করা এবং চিকিৎসাসেবা

মোঃ আবদুল হামিদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় ২৪শে এপ্রিল ২০১৮ বঙ্গভবনের দরবার হলে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী–পিআইডি

দেওয়ার সময় রোগীর সক্ষমতা বিবেচনায় রাখতে চিকিৎসকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর চাঁদপুর সফর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা এপ্রিল চাঁদপুর সফর করেন। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী চাঁদপুরের হাইমচরের চরভাঙায় বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ষষ্ঠ জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প 'কমডেকার' উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে তিনি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রোভার স্কাউটদের আরো যোগ্য ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার আহ্বান জানান। সারাদেশে স্কাউট কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সব ধরনের সহায়তা সরকার দেবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বিকেলে চাঁদপুর স্টেডিয়ামে এক জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। জনসভাস্থলে প্রধানমন্ত্রী চাঁদপুরের উন্নয়নে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং চাঁদপুরে একটি মেডিক্যাল কলেজ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, একটি নৌবন্দর ও পর্যটন কেন্দ্র করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তিনি ৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে '৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা ২০১৮'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্ত করা এবং পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। তিনি চাহিদানুযায়ী নতুন পণ্য উৎপাদন এবং নতুন বাজার সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলেও আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া তিনি সরকার দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে দেশের সকল জেলা-উপজেলায় এসএমই পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করার কথা উল্লেখ করেন।

জেলা-উপজেলায় মডেল মসজিদ উদ্‌বোধন

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের কাছে তুলে ধরতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। দেশের জনগণ যাতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা এপ্রিল চাঁদপুরের হাইমচরের চরভাঙায় বাংলাদেশ স্কাউটস এবং রোভার স্কাউটস -এর ৬ষ্ঠ জাতীয় কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্প (কমডেকা)-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সংস্কৃতি ভালোভাবে রপ্ত করতে পারে সেজন্য সরকার প্রত্যেক জেলা-উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। ৫ই এপ্রিল গণভবন থেকে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ১টি করে মোট ৫৬০টি মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণকাজের উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। এছাড়া তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় সদ্য সমাপ্ত কোম্পানিগঞ্জ-মুরাদনগর-হোমনা মহাসড়ক ও গৌরিপুর-হোমনা সেতু, কুমিল্লার শাসনগাছা রেলওয়ে ওভারপাস এবং কুমিল্লার পদুয়ারবাজার রেলওয়ে ওভারপাস-এর উদ্‌বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সৌদি আরব সফর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই এপ্রিল সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। স্থানীয় সময় ৭.২৫ মিনিটে দাম্মাম কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসীহ এবং সৌদি সরকারের প্রতিনিধিগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। পরে বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রীকে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে শেরাটন দাম্মাম হোটেলে নেওয়া হয়। ১৬ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ আল জুবাইলে অনুষ্ঠিত 'গালফ শিল্ড-১' নামের একটি যৌথ সামরিক মহড়ার কুচকাওয়াজ ও সমাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সৌদি বাদশা ও দুই পবিত্র মসজিদের হেফাজতকারী সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কুচকাওয়াজে বাংলাদেশসহ ২৪টি দেশের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা অংশ নেয়।

লন্ডন সফর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই এপ্রিল সৌদি আরব সফর শেষে বিকেলে লন্ডনের উদ্দেশ্যে দাম্মাম ত্যাগ করেন। সেদিন রাতে তিনি লন্ডনের হিথ্রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেন। ১৭ই এপ্রিল সকালে প্রধানমন্ত্রী ওয়েস্ট মিনিস্টারের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ নারী ফোরামের 'এডুকেট টু এম্পাওয়ার: মেকিং ইকুইটেবল অ্যান্ড কোয়ালিটি প্রাইমারি এডুকেশন অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন আ রিয়েলিটি ফর গার্লস অ্যাক্রোস দ্য কমনওয়েলথ' অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। বিকেলে যুক্তরাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ থিংক ট্যাংক বৈদেশিক উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (ওডিআই) আয়োজিত বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি: নীতি অগ্রগতি ও সম্ভাবনা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ১৮ই এপ্রিল লন্ডনের গিল্ড হলে স্থানীয় সময় বিকেলে কমনওয়েলথ বিজনেস ফোরাম আয়োজিত এশীয় নেতাদের 'এশীয়া কী তার অগ্রগতি ধরে রাখতে পারবে?' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সমৃদ্ধ ও শান্তিময় এশিয়া গঠনে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরেন এবং শান্তিপূর্ণ, উন্নত ও স্থিতিশীল এশিয়া গঠনে পারস্পরিক সেতুবন্ধন, যোগাযোগ বৃদ্ধি, জনগণের মতবিনিময় ও বোঝাপড়া বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে এ অঞ্চলের নেতাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী ১৯ শে এপ্রিল ন্যানকোস্টার হাউসে ২৫ তম কমনওয়েলথ হেডস অব গভর্নমেন্ট সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বক্তব্য প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য কমনওয়েলথকে তার লক্ষ্য অর্জনে সংস্কারের আহ্বান জানান। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ, প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে সহ বিশ্বনেতাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ও তাঁদের দেওয়া নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ওয়েস্ট মিনিস্টারের সেন্টার হলে যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং ২৩ শে এপ্রিল দেশে ফেরেন।

প্রধানমন্ত্রীর অস্ট্রেলিয়া সফর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই এপ্রিল ২০১৮ লন্ডনে Overseas Development Institute Bangladesh Development Story Policy, Progress and Prospects বিষয়ে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

৫ই মে ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ওআইসি-এর ৪৫তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ শে এপ্রিল ৩ দিনের সফরে 'গ্লোবাল সামিট অব উইমেন সম্মেলন'-এ যোগ দিতে অস্ট্রেলিয়া যান। ২৭শে এপ্রিল সিডনি আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশে নারী শিক্ষা এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকার জন্য মর্যাদাপূর্ণ গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ তে ভূষিত করা হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রীতিভোজেও অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ২৮ শে এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুলের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। ভিয়েতনামের ভাইস প্রেসিডেন্ট জাং থাই নগক থিন এবং অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলি বিশপ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া তিনি সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন ও হোটেল সোফিটেলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং ২৯শে এপ্রিল অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করেন।

ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই মে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ওআইসি'র পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ৪৫তম সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) কে বিপন্ন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'ইসলামি বিশ্বের রূপকল্প এমন হবে যাতে আমরা আমাদের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারি। নিজেরাই সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমাধান করতে পারি। দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পথ আমাদের নিজেদেরই খুঁজে বের করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ৫ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন। ওআইসি মহাসচিব ইউসুফ এ ওসাইমিন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীকে পবিত্র কাবা শরিফের গিলাফ উপহার দেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী স্মারক ডাকটিকেটও অবমুক্ত করেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য মন্ত্রণালয় : বিশেষ প্রতিবেদন

উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার আহ্বান

শুধু সমালোচনা নয়, উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরাও গণমাধ্যমের পবিত্র দায়িত্ব বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। উন্নয়ন সংবাদের পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরা ইতিবাচক। কিন্তু সমালোচনার ভিড়ে গণমুখী উন্নয়নের বিশাল কর্মযজ্ঞ যেন আড়াল হয়ে না যায় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী। ১৮ই এপ্রিল বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের সেমিনার হলে প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহারের সভাপতিত্বে 'উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

কর্মশালায় নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সঠিক আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের কলম ধরার আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, গণমাধ্যমকে তুলে ধরতে হবে এদেশের অর্থনীতির মূল তিনটি স্তম্ভ– কৃষক, পোশাক শ্রমিক ও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী প্রবাসীদের কথা। সেই সাথে সৎ উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের কথাও তুলে ধরতে হবে।

বাংলাদেশ সম্প্রীতির দেশ

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বলেছেন, বাংলাদেশ আজ এক সম্প্রীতির দেশে পরিণত হয়েছে। এখানে আজ মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ নেই। সব মানুষ আজ সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে সবার। ৭ই এপ্রিল কলকাতায় 'সম্প্রীতির বাংলাদেশ' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা জানান তিনি।

তারানা হালিম বলেন, শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে সম্প্রীতির দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রধান কারিগর। স্বল্প আয়ের দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ হয়েছে। সেমিনারে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত শক্তি উৎস মন্ত্রী শোভনদেব

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৮ই এপ্রিল ২০১৮ প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ-এর সেমিনার কক্ষে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত 'উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

চট্টোপাধ্যায় বলেন, সত্যিই আজ বাংলাদেশ সম্প্রীতির দেশে পরিণত হয়েছে। আজ বাংলাদেশ না হলে গোটা বিশ্বে বাংলা ভাষার এত কদর হতো না।

তথ্যপ্রযুক্তির নতুন উদ্ভাবনী ক্ষেত্রকে এগিয়ে নেবে ডেভো টেক

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২১শে এপ্রিল গুলশানে ডেভো টেক আইসিটি পার্ক এবং এর একটি সংস্থা ইমাজিন এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেডের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ডেভো টেক আইসিটি পার্ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নতুন উদ্ভাবনী ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী অরো বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের প্রথম ধাপে শেখ হাসিনার সরকার ইন্টারনেটসহ প্রযুক্তিকে সহজভাবে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। এখনকার ধাপ উদ্ভাবনার। ডেভো টেক সেই উদ ৮াবনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। ডেভো টেক তরুণ উদ্ভাবকদের জনগণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির সুফল পৌঁছানোর বিষয়ে উৎসাহ দেবে ও বিনিয়োগ করবে, যা বেসরকারি খাতের একটি চমৎকার উদ্যোগ বলেও উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

১১তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

২রা এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে ১১তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– নারী ও বালিকাদের ক্ষমতায়ন হোক-না তাঁরা অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু

দেশজুড়ে শুরু হয় এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা।

জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদযাপিত

৩রা এপ্রিল: নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদযাপিত হয় জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– ঐতিহ্যের ভিত্তি ধরি দেশের ছবি রক্ষা করি।

একনেক সভা

এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় ভূমি অধিগ্রহণ ও খনন শীর্ষক প্রকল্পসহ মোট ১০টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস পালিত

৬ই এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'ক্রীড়ায় শান্তির সমাবেশ, উন্নয়নে বাংলাদেশ'।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত

৭ই এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সবার জন্য সর্বত্র'।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৯ই এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সরকারি ই-মেইল নীতিমালা-২০১৮-এর খসড়া অনুমোদিত হয়।

একনেক সভা

১০ই এপ্রিল: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির একনেক সভায় রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পসহ মোট ১৬ প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

বর্ষবরণ উদযাপন

১৪ই এপ্রিল: সারাদেশে বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে উদযাপন করে বর্ষবরণ ১৪২৫।

পবিত্র শবে মেরাজ পালিত

ভাবগাম্ভীর্য ও যথাযথ মর্যাদায় সারাদেশে পবিত্র শবে মেরাজ পালিত হয়।

বিশ্ব কণ্ঠ দিবস পালিত

১৬ই এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারিভাবে নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় বিশ্ব কণ্ঠ দিবস।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত

১৭ই এপ্রিল: নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে পালিত হয় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস

২২শে এপ্রিল: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় বিশ্ব ধরিত্রী দিবস।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১১তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০১৮

২৩শে এপ্রিল: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৩ থেকে ২৯শে এপ্রিল জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০১৮ উদ্‌যাপিত হয়। সপ্তাহটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'খাদ্যের কথা ভাবলে পুষ্টির কথাও ভাবুন'।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

গালফ শিল্ড-১ কুচকাওয়াজে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর জোটের যৌথ সামরিক মহড়া 'গালফ শিল্ড'-এর কুচকাওয়াজ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সৌদি আরবের বাদশা সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ১৬ই এপ্রিল দেশটির আল-জুবাইর প্রদেশে অনুষ্ঠিত মহড়ায় বাংলাদেশসহ ২৪টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

উপ-সাগরীয় অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ সামরিক মহড়া এটি। উপ-সাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সামরিক সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সৌদি আরব মাসব্যাপী এই মহড়ার আয়োজন করে।

কমনওয়েলথ সংস্কারের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণে সংস্থাটি সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'আমরা কমনওয়েলথ- এর ব্যাপক সংস্কারের জন্য একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রুপ (ইপিজি) গঠনের সুপারিশ করছি।

যুক্তরাজ্যের লন্ডনে দুই দিনব্যাপী কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানদের বৈঠকের (সিএইচওজিএম) উদ্‌বোধনী দিনে ২০ শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে কমনওয়েলথ সচিবালয় পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করে শেখ হাসিনা বলেন, সিএইচওজিএম সভায় নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনেই এর প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ২৫তম সিএইচওজিএম কমনওয়েলথকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দারিদ্র্যমুক্ত, প্রগতিশীল, সমৃদ্ধ, স্পন্দনশীল ও স্বপ্নদর্শী হিসেবে অনুধাবনে একধাপ এগিয়ে নিতে পারে।

জাতিসংঘের তিন নির্বাচনে বাংলাদেশের জয়

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) ১৬ই এপ্রিলের নির্বাচনে তিনটি বড়ো বিজয় পেয়েছে বাংলাদেশ।

এতে বাংলাদেশ তিন বছরের জন্য ইউনিসেফ-এর নির্বাহী সদস্য, ইউএন উইমেন-এর নির্বাহী সদস্য তিন বছর এবং চার বছরের জন্য কমিশন অব দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন-এর (সিএসডব্লিউ) নির্বাহী বোর্ডের সদস্য হয়েছে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন জানিয়েছে, নারী ও শিশুদের জীবনযাপনের উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় এ নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাঠমান্ডুর পথে প্রথম বাংলাদেশের বাস

নেপালের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ চালুর লক্ষ্যে ২৩শে এপ্রিল বাংলাদেশ থেকে দুটি বাস পরীক্ষামূলক যাত্রায় রওনা হয়েছে নেপালের কাঠমান্ডুর পথে। এদিন সকাল ৯টায় কমলাপুর বিআরটিসির আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল থেকে বিআরটিসির তত্ত্বাবধানে শ্যামলী এন আর পরিবহণের বাস দুটি নেপালের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের যুগ্মসচিব এহসান এ এলাহীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ২৫জন এ বাসে যাত্রী হয়েছেন। এছাড়া ভারতের ১১জন, নেপালের ৬জন এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের দুজন আছেন এই দলে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই এপ্রিল ২০১৮ সৌদি আরবের দাম্মামে গালফ শিল্ড-১-এর যৌথ সামরিক মহড়া প্রত্যক্ষ করেন–পিআইডি

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

গ্লোবাল উইমেন'স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রধানমন্ত্রী

গ্লোবাল উইমেন'স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৭শে এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত 'গ্লোবাল সামিট অব উইমেন'-এ প্রধানমন্ত্রীর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন সম্মেলনের সভাপতি আইরিন নাতিভিদাদ। বাংলাদেশসহ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী শিক্ষা এবং নারী উদ্যোক্তার প্রসারে অভূতপূর্ব নেতৃত্বদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এনজিও 'গ্লোবাল সামিট অব উইমেন' এ পদক প্রদান করে।

অস্ট্রেলিয়া সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে এপ্রিল ২০১৮ সিডনির আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গ্লোবাল উইমেন সামিট-এর প্রেসিডেন্ট ওৎবহব ঘধঃরারফধফ-এর কাছ থেকে গ্লোবাল উইমেন'স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন–পিআইডি

এর আগে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে, জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন, ইউনেস্কোর সাবেক মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভাসহ আরো অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তি এ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারটি পান।

'মাদার অব এডুকেশন' আখ্যা পেলেন শেখ হাসিনা

বিশ্ববাসীর দেওয়া মাদার অব হিউম্যানিটি খেতাব পাওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার দেশের মাটিতে ভূষিত হলেন 'মাদার অব এডুকেশন' খেতাবে। সম্প্রতি ১২ই এপ্রিল সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবি মেনে নেওয়ায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তাঁকে এ অনন্য খেতাব প্রদান করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদ অধিবেশনে সরকারি চাকরিতে কোনো কোটা থাকবে না বলে ঘোষণা দেন। এরপরই সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী কোটা বাতিলের ঘোষণা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাবকে উত্তম এবং শিক্ষাবান্ধব হিসেবে আখ্যায়িত করে। শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আনন্দ র‍্যালি করে এবং তাঁকে 'মাদার অব এডুকেশন' খেতাবে ভূষিত করে।

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় শেখ হাসিনা

বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ জনের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বখ্যাত UvBg ম্যাগাজিন ১৯শে এপ্রিল এ তালিকা প্রকাশ করে। নেতা ক্যাটাগরির তালিকায় ২১ নম্বরে আছেন শেখ হাসিনা।

UvB‡gi রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই ১০০ জন বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী ও পুরুষ। তবে তারা সবচেয়ে ক্ষমতাবান নন। কারণ, ক্ষমতা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কিন্তু প্রভাব অত্যন্ত সূক্ষ্ম। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ, উদ্ভাবন ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ UvBg প্রতিবছর ১০০ জনকে সবচেয়ে প্রভাবশালী হিসেবে বেছে নেয়।

আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে মৃদুলা

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি)-এর সদস্য আমাতুন নূর মৃদুলা আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ কিলিমাঞ্জারো জয় করেছেন। বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ এই নারী পর্বতারোহী ৪ঠা মার্চ ১৯ হাজার ৩৪১ ফুট উচ্চতার এ শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

উইজডেন বর্ষসেরায় তিন নারী

'ক্রিকেটের বাইবেল' খ্যাত উইজডেনের পাঁচ বর্ষসেরা ক্রিকেটারের তিনজনই এবার নারী। তারা হলেন– ইংল্যান্ডের আনায়া শ্রাবসোল, হিদার নাইট ও নাটালি শিভার।

শ্রাবসোল গতবছর বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ৬ উইকেট নিয়ে নাটকীয়ভাবে শিরোপা জিতিয়েছিলেন ইংল্যান্ডকে। বিশ্বকাপ জয়ী সেই দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হিদার নাইট। আর শিরোপা জয়ে বড়ো অবদান রেখেছিলেন শিভার।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের প্রথম উন্মুক্ত কারাগার

কারাগার হোক সংশোধনাগার– সরকার এলক্ষ্যে দেশে প্রথম উন্মুক্ত কারাগার তৈরি করছে। কক্সবাজারের উখিয়ার হলদিয়া পালং ইউনিয়নের পাগলি বিল গ্রামে প্রায় ৩শ ১০ একর জমির ওপর বাংলাদেশের প্রথম ওপেন জেলটি নির্মাণ হবে। নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সীমানায় কঠোর নিয়মকানুনে আবদ্ধ না রেখে বন্দিকে মুক্ত আলো বাতাসের স্বাদ নিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। নির্দিষ্ট প্রকোষ্ট নয়, কারাগারের ভেতর তৈরি বাড়িতে সাধারণ মানুষের মতো বাস করবে বন্দিরা। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে, যাতে বন্দিরা সাজা শেষে বাইরে এসে সমাজের মূলধারায় মিশে যেতে পারে। পুনরায় অপরাধী হবে না। ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বা কম শ্রম দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিদের এ কারাগারে রাখা হবে।

প্রবৃদ্ধিতে নতুন রেকর্ড

বাংলাদেশের ৪৭ বছরের ইতিহাসের সেরা সময় এখন। কারণ চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি প্রাথমিক হিসেবে ৭.৬৫ শতাংশ বা ২৭৫ বিলিয়ন ডলার বা ২৭ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। গত বছর ছিল ২৫০ বিলিয়ন বা ২৫ হাজার কোটি ডলার। পর পর ৩ বছর ৭ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধির বিরল দৃষ্টান্ত এটি। বর্তমান সরকারের নয় বছরে এগিয়েছে ১৫ ধাপ ফলে বাংলাদেশ এখন ৪৩ তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। স্বাধীনতার পর ৩৮ বছর লেগেছে ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াতে। এ পথ পরিক্রমায় ফিনল্যান্ড, চেক রিপাবলিক সোমালিয়া, নিউজিল্যান্ড, কাতার, ভিয়েতনাম, পর্তুগাল, গ্রিস ও

পেরুর মতো দেশকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ।

প্রথমবারের মতো স্মার্ট গ্রিড

বিদ্যুৎ বিতরণে ১২২ বছরের প্রথা ভেঙে দেশে প্রথমবারের মতো স্মার্ট গ্রিড নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বিতরণ ব্যবস্থার সর্বশেষ প্রযুক্তি হচ্ছে স্মার্ট গ্রিড। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে একজন গ্রাহক নিজে যেমন তার বিদ্যুৎ ব্যবহার তদারকি করতে পারবেন। তছাড়া বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাও হবে আধুনিক এবং ত্রুটিহীন। বিতরণ ত্রুটি খুঁজে বের করাসহ এক জায়গায় বসেই সমস্যার সমাধান করা যাবে। একটি এলাকার দুর্ঘটনার কারণে অন্য এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার যেন ক্ষতি না হয় স্মার্ট গ্রিড সে বিষয়েও সাহায্য করবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্যাট আদায় না করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই এপ্রিল শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক)-এর বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভ্যাট আদায় না করার নির্দেশ দেন। এমনকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সবকিছুই ভ্যাটমুক্ত থাকবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৫ই এপ্রিল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন (আইডিইবি) মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ আয়োজিত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক এক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বক্তৃতাকালে শিক্ষামন্ত্রী কারিগরি শিক্ষাকে আরো জনপ্রিয় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেন।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সমাজের মূলধারায় আনতে রাষ্ট্রকে আরো দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ২০শে এপ্রিল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ১১তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৮ উপলক্ষে সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব অটিস্টিক চিলড্রেন (সোয়াক) আয়োজিত আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে মন্ত্রী মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্রকে আরো বেশি দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান। এলক্ষ্যে তিনি সোয়াকের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও বিত্তবানদের এ ধরনের শিশুদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক এডুকেশন এক্সপো ২০১৮-এর উদ্‌বোধন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ২২শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক এডুকেশন এক্সপো ২০১৮-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে মন্ত্রী বলেন, দেশের

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৫ই এপ্রিল ২০১৮ আইডিইবি ভবনে ‘ঝউএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এঞঠউএ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। এসময় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কাজী কেরামত আলী উপস্থিত ছিলেন-পিআইডি

বাইরেও বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করছে এদেশের তরুণ-তরুণীরা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারাই প্রতিনিধিত্ব করছে। তাই তিনি বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৩শে এপ্রিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ব বই ও কপিরাইট দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ‘আলোকিত প্রজন্মের জন্য সৃজনশীল বই পড়ার গুরুত্ব’ শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় ভাষণকালে মন্ত্রী বলেন, ভালো বই পড়ার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরিতে বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তিনি আলোকিত নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীদের জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে আইসিটি প্রতিযোগিতা ২০১৮-এর উদ্‌বোধন করা হয়েছে ২১শে এপ্রিল। অমিত সম্ভাবনার অধিকারী দেশের যুব প্রতিবন্ধীদের আইসিটি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল তৃতীয়বারের মতো এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।

সারাদেশ থেকে আগত ৬০ জন প্রতিযোগী মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেটসহ ৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে সেরা তিনজনকে পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট

প্রদান করা হয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দক্ষতার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল পরিচালিত উচ্চতর কোর্সে বিনা ফি'তে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। সব অংশগ্রহণকারীকে আইসিটি বিভাগ ও বিবিসি আয়োজিত চাকরি মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগও দেওয়া হবে।

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'সচেতনতাই পারে দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে'–এই শিরোনামে বিতর্ক অনুষ্ঠানের উদবোধনীতে সমাজকল্যাণমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেন, 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়।' তাই প্রাইভেট ও পাবলিক পার্টনারশিপ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি প্রথমবারের মতো সম্প্রতি এফডিসিতে এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

রাশেদ খান মেনন বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। না হলে অনেক ভালো উদ্যোগ ও কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন সম্ভব নয়।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন

১লা এপ্রিল থেকে ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত দেশজুড়ে পালিত হয়েছে ২০তম জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ। এই কার্যক্রমে দেশের সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একযোগে কৃমিনাশক ওষুধ খেয়েছে ৪ কোটি ৪ লাখ শিশু, যাদের বয়স ৫ থেকে ১৬ বছর। পুরো সপ্তাহজুড়ে স্কুলগামী, স্কুল বহির্ভূত এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া সব শিক্ষার্থীকে এক ডোজ করে কৃমিনাশক খাওয়ানো হয় বিনামূল্যে। মহাখালীর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

চিকিৎসা শিক্ষার মান নিয়ে কোনো আপোশ নয়

জনগণের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দক্ষ চিকিৎসকের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য চিকিৎসা শিক্ষার মান নিয়ে কোনো আপোশ করা হবে না। মানহীন মেডিক্যাল কলেজগুলো বন্ধ করতেও সরকার দ্বিধা করবে না। ২রা এপ্রিল সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ পরিচালনা নীতিমালা সংস্কার সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্বকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন এবং আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা করে সংশোধনের সুপারিশসহ প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির মানোন্নয়নে পদক্ষেপ

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির মান বাড়ানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের আরো তৎপর হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, সরকার গুরুত্ব দিয়ে এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির মানোন্নয়নে পদক্ষেপ নিচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারি হাসপাতালে বিকল্প চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ১৮ই এপ্রিল সচিবালয়ে দেশীয় চিকিৎসক সমিতি, বাংলাদেশ ইউনানী আয়ুর্বেদিক বোর্ড এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের সমন্বয়ে এক যৌথ সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে 'বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি আইন' এবং 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন' দ্রুত চূড়ান্ত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।

ধর্ষণ পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন

ধর্ষণের শিকার নারীর মেডিক্যাল পরীক্ষায় 'টু ফিঙ্গার' পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছে হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ধর্ষণের শিকার নারীর মেডিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে হেলথ কেয়ার প্রটোকলে বর্ণিত পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। ১২ই এপ্রিল হাইকোর্ট এ আদেশ দেয়।

আদেশে আরো বলা হয়, টেস্টের সময় নারীর আত্মীয়, চিকিৎসক, পুলিশ ও নারী নার্স রাখতে হবে। বিচারকালে আইনজীবী কখনো ধর্ষিতাকে অমর্যাদাকর প্রশ্ন করতে পারবে না।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৮ অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠিত হলো জমজমাট 'বিজনেস প্রসেসিং আউটসোর্সিং (বিপিও) সামিট বাংলাদেশ ২০১৮'। ১৫ই এপ্রিল রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে দুই দিনব্যাপী (বিপিও) সামিটের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। সামিটে প্রযুক্তি ব্যবসা বিশেষ করে আউটসোর্সিং ব্যবসা পরিচালনা, ব্যবসায়ের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে ধারণা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে সজীব ওয়াজেদ জয় জানান, তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে। প্রতি বছর ৩০ হাজার তরুণকে প্রশিক্ষণ এবং আগামী ২০২১ সালে ১ লাখ তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর এই তরুণরাই দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হবে।

সম্মেলনে দেশি-বিদেশি তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, সরকারের নীতিনির্ধারক, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং বিপিও খাতের সঙ্গে জড়িতরা অংশ নেন। ১০টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ৪০ জন স্থানীয় এবং ২০ জন আন্তর্জাতিক বক্তা সম্মেলনে বক্তব্য দেন।

অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা বাড়ছে

চালু হওয়ার এক বছর ১৫ দিনের মধ্যে অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়েছে। ব্যবসায়ীরা অনলাইনে ইলেকট্রনিক বিজনেস আইডেনটিফিকেশন নম্বর বা ই-বিআইএন নিতে পারছেন। গত অর্থবছর থেকে এ সুবিধা চালু হয়েছে। এনবিআর সূত্রে জানা যায়, ১৭ই এপ্রিল দিন শেষে অনলাইনে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ লাখ ৩২টি।

প্রথম বছর সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ। অনলাইনে সেবা নেওয়ার জন্য ভ্যাট নিবন্ধন বা ই-টিআইএন নেওয়ার বিষয়টি অনেকটা অনলাইনে কর শনাক্তকরণ নম্বর বা ই-টিআইএনের মতো। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা ঘরে বসেই ভ্যাট নিবন্ধন নিতে পারছেন। যেসব প্রতিষ্ঠান সনাতন পদ্ধতিতে নিবন্ধিত তাদেরকেও নতুনভাবে অনলাইনে নিবন্ধন নিতে হবে। বার্ষিক লেনদেন ৩০ লাখ টাকার বেশি হলেই এ নিবন্ধন করতে হয়। উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৮ লাখ।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

শান্তিচুক্তি পার্বত্য অঞ্চলের শান্তির মাইলফলক

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি করেছিল বলে আজ পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষিসহ সবক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। পাহাড়ের সবাই শান্তিতে নিজ উৎসবের আনন্দে মুখরিত। এই শান্তিচুক্তিই পার্বত্য অঞ্চলের শান্তির মাইলফলক। ১৮ই এপ্রিল বান্দরবানের রাজবিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মারমা সম্প্রদায়ের মহা সাংগ্রাই পোয়েঃ ও ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং মৈত্রী পানি বর্ষণ (জলকেলি) লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। পরে তিনি মারমা সম্প্রদায়ের মহা সাংগ্রাই পোয়েঃ ও ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সরকার পার্বত্যবাসীর জীবনমান উন্নয়নে আন্তরিক

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বর্তমান সরকার পার্বত্যবাসীর জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বৈসাবি উৎসবে এখন দেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মিলিত হয়ে পালন করে বলেই বৈসাবি উৎসব সকল সম্প্রদায়ের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। ১১ই এপ্রিল বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ের বাগান পাড়ায় ম্রো সম্প্রদায়ের বর্ষবরণ উৎসব 'চাংক্রান' উদ্‌বোধনকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বান্দরবানে মারমাদের সাংগ্রাই পালন

পুরনো বছরকে পেছনে ফেলে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে বান্দরবানের মারমা সম্প্রদায় তাদের প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান 'সাংগ্রাই' পালনের অংশ হিসেবে ১৩ই এপ্রিল জেলা শহরের রাজার মাঠ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্যবাসীর সামাজিক সেবা নিশ্চিতকরণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার ফলে এখানে বসবাসরত সকল সম্প্রদায় তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন আরো সংহত করেছে।

উল্লেখ্য, ১৪ই এপ্রিল সাঙ্গু নদীতে বুদ্ধমূর্তি স্নান, ১৫ এবং ১৬ই এপ্রিল পুরাতন রাজবাড়ি মাঠে পানি বর্ষণ উৎসবের মধ্য দিয়ে জেলার সাতটি উপজেলার পাহাড়িপল্লিতে মারমাদের সাংগ্রাইয়ের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান মৈত্রী পানি বর্ষণ উৎসব (জলকেলি) শুরু হয়। ১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় বৌদ্ধ বিহারে সমবেত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এ উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে অংশ নিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, আজকের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের কর্ণধার। তাদেরকে লেখাপড়ার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবারে ভূমিকা রাখতে হবে। একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুনধুম উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী ২২শে এপ্রিল এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা অর্জন করে শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাহলেই টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ধানের নতুন জাত উদ্ভাবন

কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন জাতের ধান 'রাবি ধান-১'। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোনমি অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল হক উদ্ভাবন করেছেন এটি। ইতোমধ্যে রাবি ধান-১-এর স্বীকৃতি দিয়েছে ন্যাশনাল সিড বোর্ড ও বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ কাউন্সিল (বিএআরসি)। খুব শীঘ্রই বাজারজাত করা হবে এটি।

চিকন মিনিকেট চাল উৎপন্ন হবে রাবি ধান-১ থেকে। আবাদ উঠতে সময় লাগবে মাত্র ১৩০ দিন। ২০১৫ ও ২০১৬ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষামূলক চাষ করা হয় এ ধান। উল্লেখ্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত নতুন ধান আবিষ্কারের ইতিহাস এটাই প্রথম।

সারাদেশে প্রথমবারের মতো কৃষি পল্লি জরিপ

প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী শুরু হচ্ছে কৃষি ও পল্লি পরিসংখ্যান জরিপ (এআরএএস)। দেশের ৬৪ জেলার ৮০ হাজার খানায় কৃষি ও পল্লি পরিসংখ্যানের তথ্য সংগ্রহ করা হবে এই জরিপের মাধ্যমে।

নির্ভুল তথ্য অনুসন্ধানে পল্লি এলাকায় খানার আর্থসামাজিক অবস্থান, মালিকানাভিত্তিক কৃষিজমি, কৃষিকাজে ব্যবহৃত সেচ, সার, বীজ, বালাইনাশক ও কীটনাশক, কৃষিঋণ এবং ঋণের ব্যবহার, কৃষি যন্ত্রপাতি, যাতায়াত, কৃষিপণ্য বিপণন এবং কৃষি মূল্য, কৃষি শ্রমিক, কর্মঘণ্টা, শ্রমিকের মজুরির হার, লিঙ্গ সমতা, পরিসংখ্যান ও নারীর ক্ষমতায়নের তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ৮ই এপ্রিল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে (বিবিএস) এআরএএস প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন বিবিএস-এর ভারপ্রাপ্ত সচিব সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। বিবিএস সূত্রে জানা যায়, চলতি সময় থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে সম্পূর্ণ হবে জরিপটি।

প্রতিষ্ঠা করা হলো ছাদ বাগানভিত্তিক ইকোসেন্টার

দেশে প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ছাদ বাগানভিত্তিক ইকোসেন্টার। বাতাস বিশুদ্ধকরণ ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এটি। ইকোসেন্টারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণও ইতোমধ্যে দেওয়া হয়েছে। শহরের অনাবাদি বা ফাঁকা ছাদে কীভাবে কৃষিকে সম্প্রসারণ করে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায়– সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই ইকোসেন্টার থেকে। পাশাপাশি খরা ও তাপ উপশম কৌশলের মাধ্যমে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন জাতের ফসল কীভাবে ছাদে উৎপাদন করা যায় সে তথ্য ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হবে এ কেন্দ্র থেকে।

ফলন বাড়বে হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে

বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগী একটি দ্রবণ আবিষ্কার করেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যান তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. জাহিদুর রহমান। উদ্ভাবিত এ দ্রবণটি সঠিক পরিমাণে ব্যবহার করা হলে প্রতিটি গাছ থেকে মাঠ ফসলের চেয়ে ৮-১০ গুণ বেশি ফলন পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি। উদ্ভাবিত পুষ্টি দ্রবণ ব্যবহার করে টমেটো, ক্যাপসিকাম, মরিচ, করলা, লেটুস, শশা, কলা, ঢেঁড়স ও বিভিন্ন শাকজাতীয় সবজির ফলন মাঠের চেয়ে প্রায় ৮ থেকে ১০ গুণ বেশি পাওয়া যায় গবেষণায়।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

এগিয়ে চলছে লেবুখালী সেতুর নির্মাণ কাজ

দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে পটুয়াখালীর পায়রা নদীর ওপরে প্রায় ১৫শ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত লেবুখালী সেতু। কুয়েত সরকারের অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ বিভাগের তত্ত্বাবধানে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান লংজিয়াম চাইনিজ কোম্পানি সেতুটি নির্মাণ করছে। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে সেতুটির নির্মাণ কাজ। সেতুটি নির্মিত হলে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। খুলে যাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটার সম্ভাবনার দ্বার।

গ্রীন লাইনের নতুন এসি ডাবল ডেকার বাস সার্ভিস উদ্‌বোধন

মানুষের আরাম ও রুচির কথা ভেবে দেশে নতুন নতুন চারলেনের রাস্তা ও উড়াল সেতু নির্মাণের পাশাপাশি অত্যাধুনিক বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। নৌপরিবহণ মন্ত্রী শাজাহান খান সম্প্রতি ঢাকায় রাজারবাগে গ্রীন লাইন পরিবহণের ডাবল ডেকার বাস সার্ভিসের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সারাবিশ্বে সড়ক পরিবহণে আধুনিক মানসম্মত গাড়ি চলাচল করছে, বাংলাদেশেও যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক মানসম্মত গাড়ির প্রয়োজন। সে বিষয়টি চিন্তা করে গ্রীন লাইন কোম্পানি সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সিলেট ও কক্সবাজারবাসীর সুবিধার কথা বিবেচনা করে বিশ্বখ্যাত ব্রান্ডের দৃষ্টিনন্দন, বিলাসবহুল বাস আমদানি করেছে।

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে পটুয়াখালীর লেবুখালী সেতুর নির্মাণ কাজ

বিএসসিতে আসছে নতুন জাহাজ 'বাংলার জয়যাত্রা'

সাতাশ বছর পর আগামী জুলাই মাসে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) বহরে যুক্ত হবে নতুন জাহাজ 'এম ভি বাংলার জয়যাত্রা'। ৩৯ হাজার ডেড ওয়েট টন (ডিডব্লিউটি) ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বাল্ক ক্যারিয়ারটি চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি) কর্তৃক তৈরি হয়েছে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

৩০ লাখ গাছের চারা রোপণের সিদ্ধান্ত

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনিসুল মাহমুদ বলেছেন, ৩০ লাখ শহিদের স্মৃতির উদ্দেশে ৩০ লাখ গাছের চারা রোপণ করবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। ২রা এপ্রিল সচিবালয়ে পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সভায় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ বীর শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এতে প্রতীকীভাবে আমাদের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি দেশের পরিবেশ রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কাজে লাগানো হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ

বিশ্বের পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিজ ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তবে ঝুঁকিও আছে। বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক অনুযায়ী, বিশ্বের শীর্ষ ১০টি ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। তাই স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্বব্যাংক এবং ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচারের যৌথ আয়োজনে ১১ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট স্মার্ট ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান্ট উদ্‌বোধনকালে বক্তারা একথা বলেন। পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিতে হবে উপযুক্ত পদ্ধতি ও পদক্ষেপ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ুর ঝুঁকি কমাতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতসহ দেশের সর্বস্তরে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকার সারাবছরই পরিবেশ উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করতে বদ্ধপরিকর

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, শুধু একটি সপ্তাহ নয় সারাবছরই সরকার দেশের পরিবেশ উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করতে বদ্ধপরিকর। পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে সেই সক্ষমতা অর্জন করেছে। সরকারের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে দেশের প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের অধিক হারে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত আগারগাঁও বন ভবনে বাংলাদেশের এলডিসি স্ট্যাটাস থেকে উত্তরণ উদযাপনের 'বিশেষ সেবা সপ্তাহ' পালন উপলক্ষে আয়োজিত 'দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। শুধু সেবাই নয়, সরকার পরিবেশসম্মত শিল্পকারখানা স্থাপনে এখন থেকে সহায়ক ও পরামর্শক হিসেবেও কাজ করবে বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন বাড়ি পেল রংপুরের ৭৬ পরিবার

'আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার'-এ স্লোগানকে সামনে রেখে যার জমি আছে, ঘর নেই, তার নিজ জমিতে 'গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে'র আওতায় রংপুর কাউনিয়া উপজেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে উপজেলার ছয় ইউনিয়নে অসহায়-দরিদ্র ৭৬ পরিবারকে দেওয়া হয় নতুন পাকা বাড়ি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের 'গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে'র দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭২ লাখ টাকা ব্যয়ে বালাপাড়া ইউনিয়নে ১৩টি, শহীদবাগে ১১টি, টেপা-মধুপুরে ১২টি, কুর্শায় ১২টি, সারাইয়ে ১২টি, হারাগাছে ১২টি ও চলমান চারটিসহ মোট ৭৬টি বাড়ি নির্মাণ করে বিতরণ করে স্থানীয় প্রশাসন। শুধু রংপুরই নয় সারাদেশে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় অসহায়-দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে নতুন পাকা বাড়ি।

দেশের প্রতিটি শিশু পরিবারে খোলা হয়েছে বৃদ্ধাশ্রম

সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত দেশের প্রতিটি শিশু পরিবারে খোলা হয়েছে বৃদ্ধাশ্রম। যেখানে পরিবারের অবহেলিত বয়স্ক ব্যক্তিগণ নিজের বাড়ির মতো শিশুদের সঙ্গে থাকবেন। শিশুদের মনে করবেন তারাই নাতি-নাতনি। এসকল বয়স্ক ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করে সরকার দেশে প্রথমবারের মতো সব শিশু পরিবারে ৬৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়স্কদের আবাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রতিটি শিশু পরিবারে বয়স্কদের জন্য ১০টি করে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। যে শিশু পরিবার শুধু মেয়েদের জন্য সেখানে শুধু বৃদ্ধাগণ থাকতে পারেন।

শিশু পরিবারের শিশুদের জন্য যে বরাদ্দ বয়স্কদের জন্য একই বরাদ্দ। প্রতিজন নিবাসীর জন্য মাসে বরাদ্দ আছে ২ হাজার ছয়শত টাকা। এর মধ্যে খাবারের জন্য বরাদ্দ ২ হাজার টাকা। বাকি বরাদ্দ অন্যান্য খরচের জন্য। পুষ্টির চাহিদা পূরণে সেখানে মাছ, মুরগি, দুধ, সবজিসহ উন্নতমানের খাবার দেওয়া হয়। চিকিৎসার জন্য রয়েছে খণ্ডকালীন একজন চিকিৎসক।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

দ্বিতীয় তিস্তা সড়ক সেতুর নির্মাণ সম্পন্ন

রংপুর ও লালমনিরহাট জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বিতীয় তিস্তা সড়ক সেতুর কাজ এ বছরের জানুয়ারিতে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১০ সালের ২২শে এপ্রিল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী বৈঠকে (একনেক) তিস্তা দ্বিতীয় সড়ক সেতুর নির্মাণে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১২১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০১২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গঙ্গাচড়া উপজেলার মহিপুর ও লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কাকিনা রুটে ৮৫০ মিটার দৈর্ঘ্য ও সাড়ে ৯ মিটার প্রস্থের দ্বিতীয় তিস্তা সেতুর নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন। এ সেতুটি নির্মাণের ফলে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম ও আদিতমারী উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে রংপুর তথা দেশের যে-কোনো জেলায় যাতায়াত করতে পারবেন।

এগিয়ে চলছে মেট্রোরেলের কাজ

রাজধানীবাসীর বহু প্রতীক্ষিত মেট্রোরেলের লাইন স্থাপনে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় দুটি পিয়ারের ওপর ভায়াডাক্ট বসানোর পর এখন আগারগাঁও ওয়ে দুটি পিয়ারে কংক্রিট ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলছে। এ প্রকল্পটি ৮টি প্যাকেজের আওতায় বাস্তবায়ন হবে। এর মধ্যে ১ নম্বর প্যাকেজের আওতায় দিয়াবাড়ি এলাকার ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালের অক্টোবরে। এ বছরের জানুয়ারিতে এ কাজের ১০০ ভাগ অগ্রগতি হয়েছে। ডিপো এলাকার কাজ শুরু হয়েছে প্যাকেজ-২-এর আওতায়। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ভায়াডাক্ট এবং স্টেলন নির্মাণ কাজ হচ্ছে প্যাকেজ ৩ ও ৪-এর আওতায়। আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ভায়াডাক্ট এবং স্টেলন নির্মাণ কাজ হবে প্যাকেজ ৫ এবং ৬-এর অধীনে। এ প্রকল্পের বৈদ্যুতিক এবং মেকানিক্যাল সিস্টেম বাস্তবায়ন হবে ৭ নম্বর প্যাকেজের আওতায়। রেলের কোচ এবং ডিপোর যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ হবে প্যাকেজ ৮-এর অধীনে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

যুবসমাজকে মাদক থেকে সরে আসার আহ্বান

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন ১২ই এপ্রিল কুড়িগ্রাম পৌরসভা মাঠে 'মাদকমুক্ত সমাজ কুড়িগ্রাম' আয়োজিত জনসভায় মাদকের নানা কুফল তুলে ধরে যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। মন্ত্রী কুড়িগ্রাম জেলার সদর স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান করেন।

মাদক নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালিত

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১০ই এপ্রিল চলতি বছরের মার্চ মাসে শুরু হওয়া মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভাগীয় কার্যালয়– ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট মাদকবিরোধী সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক মাদকবিরোধী

আলোচনাসভা ও মাদকবিরোধী ফিলার প্রচারের আয়োজন করে। এছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবছর মার্চে দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য আটক করেছে। এছাড়া উক্ত সময়ে এ অধিদপ্তর ১ হাজার ৩১৫ জন আসামিকে থানায় সোপর্দ করেছে এবং ১ হাজার ১৬৪টি মামলা দায়ের করেছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশুতোষ চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত

শিশু-কিশোরদের সরব উপস্থিতিতে সিলেটে শেষ হলো দু'দিনের মৃত্তিকায় মহাকাল শিশুতোষ চলচ্চিত্র উৎসব। ২১শে এপ্রিল কবি নজরুল অডিটরিয়ামে নির্মাতা রহমান মনির পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আয়মন, নীরব ক্ষমা, সি ইউ এগেইন, দি পুশকিডস ও পণ্যতীর্থ প্রদর্শিত হয়। এই উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে মৃত্তিকায় মহাকাল চলচ্চিত্র সংসদ। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সাইমুম আনজুম ইভান বলেন, বিংশ শতাব্দীর এই সময়ে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনে চলচ্চিত্র একটি শক্ত মাধ্যম। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিশুদের মাঝে অসাম্প্রদায়িকতার মন্ত্র ছড়িয়ে দিতেই এ উৎসবের আয়োজন।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ছায়ানটের বর্ষবরণ ১৪২৫

প্রতিবারের মতো এবারো রমনা বটমূলে আয়োজিত হয় ছায়ানটের বর্ষবরণ উৎসব। ৫১তম এ আয়োজনটি শুরু হয় বাংলা মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ ভোর সোয়া ছয়টায়। বাঁশিতে ভোরের ভৈরবী রাগালাপ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দেড় শতাধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করেন এ অনুষ্ঠানে। রীতি অনুযায়ী ছায়ানটের সভাপতি সনজিদা খাতুনের কথন পর্বের পর জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় ছায়ানটের বর্ষবরণ আয়োজন। এক অসম, অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটাবার জন্য পাঁচ দশক ধরে বাংলা বছরের প্রথম লগ্ন ১লা বৈশাখের প্রত্যুষে সংগঠনটি আপন সংস্কৃতির এই অনুষ্ঠান করে আসছে। নতুন বাংলা বছরের বিষয় 'বিশ্বায়নের বাড়বতায় শিকড়ের সন্ধান'।

বিশ্ব ঐতিহ্যের মঙ্গল শোভাযাত্রা

ফকির লালন সাঁইয়ের 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। সকাল নয়টায় চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে বের হয় বিশ্ব ঐতিহ্যের মঙ্গল শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার শুরুতে ছিল সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পর্ব। এতে অংশ নেন শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান প্রমুখ। বৈশাখি সাজে সব বয়সের, সব শ্রেণিপেশার কয়েক হাজার মানুষ এতে অংশ নেয়।

আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস ২০১৮

ঢাকের বাদ্যে শুরু হয় সপ্তাহব্যাপী নৃত্য উৎসব। আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষে ২৩শে এপ্রিল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে এর আয়োজন করে বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থা। এদিন একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তন প্রাঙ্গণে আয়োজিত নৃত্যমেলার উদ্‌বোধন করেন নৃত্যগুরু লায়লা হাসান। ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ড় প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ড় চলে এ নৃত্যমেলা।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

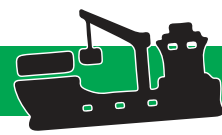

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যাওয়ার্ড পেল ১২ শিল্প প্রতিষ্ঠান

শিল্প খাতে বিশেষ অবদানের জন্য চতুর্থবারের মতো ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে। ২০১৬ সালের জন্য ৫ ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার প্রদান করা

হয়েছে। ১৮ই এপ্রিল শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু প্রধান অতিথি হিসেবে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।

মন্ত্রী তার বক্তব্যে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানি ব্যবহার করে শিল্প কারখানায় সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিল্পায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। সরকারের শিল্পবান্ধব নীতি ও উদ্যোগের ফলে দেশে শিল্পায়নের ধারা জোরদার হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান ৩৩ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

হস্ত ও কারুশিল্পের উন্নয়নে নতুন প্রকল্প গ্রহণ বিসিকের

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ১৪ই এপ্রিল বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বিসিক ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে বৈশাখি মেলার উদ্‌বোধনকালে বলেন, এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে হস্ত ও কারুশিল্পের উন্নয়নে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে বিসিক।

যে কারণে শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ ধারা

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ১৮ই এপ্রিল রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যাওয়ার্ড-২০১৬' প্রদান করেন

অব্যাহত থাকলে অচিরেই জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৪০ শতাংশে পৌঁছবে।

মন্ত্রী দেশের হস্ত ও কারুশিল্পের উন্নয়নে বিসিককে আগামী এক মাসের মধ্যে ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশ দেন। এতে দেশের হস্ত ও কারুশিল্পের প্রসার এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কারুশিল্পীরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রমজানে সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিবি পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত

রমজান উপলক্ষে সকল বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে ১৮৭টি ট্রাক টিসিবির পণ্য ডিলারের মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের নিকট সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহ করা হবে। ৫ই এপ্রিল সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৬তম বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে টিসিবির পরিকল্পনা অনুযায়ী চিনি ২ হাজার মেট্রিক টন, মসুর ডাল ১ হাজার ৫শ মেট্রিক টন, তেল ১ হাজার মেট্রিক টন, ছোলা ১ হাজার ৯৫৫ মেট্রিক টন এবং খেজুর ১শ মেট্রিক টন ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া রমজান মাসে পণ্যসামগ্রীর মূল্য যেন স্থিতিশীল থাকে সে ব্যাপারে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার তদারকি কার্যক্রম জোরদার করবে বলে বৈঠকে জানানো হয়।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৬-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এবারের তালিকায় সর্বোচ্চ সাত বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে অমিতাভ রেজা চৌধুরীর AvqbvevwR। এরপর নাদের চৌধুরীর মেয়েটি এখন কোথায় যাবে পেয়েছে চারটি, তৌকীর আহমেদের অজ্ঞাতনামা ও গৌতম ঘোষের শঙ্খচিল পেয়েছে তিনটি করে পুরস্কার।

একনজরে জাতীয় চলচ্চিত্র ২০১৬-এর তালিকা

আজীবন সম্মাননা: যৌথভাবে পাচ্ছেন চলচ্চিত্রের দুই কিংবদন্তি ববিতা ও ফারুক।

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র: অজ্ঞাতনামা। প্রযোজক: ফরিদুর রেজা সাগর।

শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র: ঘ্রাণ। প্রযোজক: এস এম কামরুল আহসান।

শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: জন্মসাথী। প্রযোজক: একাত্তর মিডিয়া লি. ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক: অমিতাভ রেজা চৌধুরী, আয়নাবাজি।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্র: চঞ্চল চৌধুরী, আয়নাবাজি।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্র: যৌথভাবে তিশা ও কুসুম শিকদার, ছবি যথাক্রমে অস্তিত্ব ও শঙ্খচিল।

শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব চরিত্রাভিনেতা: যৌথভাবে আলীরাজ ও ফজলুর রহমান বাবু। ছবি যথাক্রমে পুড়ে যায় মন ও মেয়েটি এখন কোথায় যাবে।

শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব চরিত্রাভিনেত্রী: তানিয়া আহমেদ, কৃষ্ণপক্ষ।

শ্রেষ্ঠ খল-অভিনেতা: শহীদুজ্জামান সেলিম, অজ্ঞাতনামা।

শ্রেষ্ঠ শিল্পী: আনুম রহমান খান সাঁঝবাতি, শঙ্খচিল।

শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক: ইমন সাহা, মেয়েটি এখন কোথায় যাবে।

শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক: হাবিব, নিয়তি।

শ্রেষ্ঠ গায়ক: ওয়াকিল আহমেদ, দর্পণ বির্সজন। গান-অমৃত মেঘের

বারি।

শ্রেষ্ঠ গায়িকা: মেহের আফরোজ শাওন, কৃষ্ণপক্ষ। গান- যদি মন কাঁদে।

শ্রেষ্ঠ গীতিকার: গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মেয়েটি এখন কোথায় যাবে। গান-বিধিরে ও বিধি

শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার: তৌকীর আহমেদ, অজ্ঞাতনামা।

শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা: রুবাইয়াত হোসেন, আন্ডার কনস্ট্রাকশন।

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার: অনম বিশ্বাস ও গাউসুল আলম, আয়নাবাজি।

শ্রেষ্ঠ সম্পাদক: ইকবাল আহসানুল কবির, আয়নাবাজি।

শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশক: উত্তম গুহ, শঙ্খচিল।

শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক: রাশেদ জামান, আয়নাবাজি।

শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক: রিপন নাথ, আয়নাবাজি।

শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা: যৌথভাবে সাত্তার ও ফারজানা সান, যথাক্রমে নিয়তি ও আয়নাবাজি।

শ্রেষ্ঠ মেকাপম্যান: মানিক, আন্ডার কনস্ট্রাকশন।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

কমনওয়েলথ গেমসে বাংলাদেশের রুপা জয়

অস্ট্রেলিয়ার গোল্ডকোস্টে কমনওয়েলথ গেমসের একাদশতম আসরের চতুর্থ দিনে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম পদক জয়ের গৌরব অর্জন করেছেন শুটার আবদুল্লাহ হেল বাকী। ৮ই এপ্রিল ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে দ্বিতীয় হয়ে রৌপ্য জিতেছেন তিনি। দ্বিতীয় হওয়ার ক্ষেত্রে তার স্কোর ছিল ২৪৪.৭।

অন্যদিকে বেলমন্ট শুটিং সেন্টারে ১১ই এপ্রিল ২২০.৫ স্কোর গড়ে

শুটার আবদুল্লাহ হেল বাকী

রুপা জেতেন শাকিল। ১০ মিটার পিস্তলের কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডেও ৫৪৫ স্কোর গড়ে চতুর্থ হয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন শাকিল। গোল্ডকোস্টে এ নিয়ে দ্বিতীয় পদক জিতল বাংলাদেশ।

১৯৯০ সালের অকল্যান্ড কমনওয়েলথ গেমসে আতিকুর রহমান ও আবদুস সাত্তার নিনির হাত ধরে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের দলগত ইভেন্টের স্বর্ণ জিতেছিল বাংলাদেশ। এতদিন পর কমনওয়েলথ গেমসের পিস্তল ইভেন্ট থেকে রুপা এল শাকিলের হাত ধরে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস পালিত

৬ই এপ্রিল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস। এবার দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য 'ক্রীড়ায় শান্তির সমাবেশ, উন্নয়নে বাংলাদেশ'। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে র‍্যালি, আলোচনাসভা ও বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন কর্তৃক ক্রীড়া অনুষ্ঠান।

এদিকে ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী প্রদান করেছেন। তিনি বাণীতে বলেন, 'খেলাধুলা একটি শিল্প। খেলাধুলার মূল কথাই হলো প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা। সুস্থ-সবল দেহ-মন এবং দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসা তৈরিতে খেলাধুলা অপরিহার্য। খেলাধুলা শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যবসায়, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। অপরাধ প্রবণতা কমায়। খেলাধুলা যুবসমাজকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করে। মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখে।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজংগী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এসকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।